Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামি মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেন্জ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফছানা খাতুন মুক্তা

রোলঃ ২৩১০০১২০১৯০

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামি মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেন্জ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফছানা খাতুন মুক্তা

রোলঃ ২৩১০০১২০১৯০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামি মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেন্জ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফছানা খাতুন মুক্তা, আইডিঃ ২৩১০০১২০১৯০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামি মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেনজ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Afsana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আফছানা খাতুন মুক্তা

আইডিঃ ২৩১০০১২০১৯০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১:ভূমিকা 7

১.১ গবেষণার পটভূমি 7

১.২সমস্যা নির্ধারণ 8

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য 8

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন 9

১.৫গবেষণার গুরুত্ব 9

১.৬ গবেষণার পরিধি 10

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা 10

অধ্যায় ২: ইসলামি শিক্ষার ধারণা 11

২.১ ইসলামে শিক্ষার সংজ্ঞা: 11

২.২কুরআনের আলোকে শিক্ষা: 11

২.৩ হাদীসের আলোকে শিক্ষা 17

২.৪ ইসলামি নৈতিক মূল্যবোধ, ... 20

২.৫ চরিত্র গঠনে ইসলামের ভূমিকা 22

২.৬ ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 26

২.৭প্রাচীন ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 28

অধ্যায় ৩: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। 30

৩.১আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞা 30

৩.২ আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য 30

৩.৩আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য 31

৩.৪: আধুনিক শিক্ষার ইতিবাচক দিক 33

৩.৫: আধুনিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা 34

৩.৬ বিশ্বব্যাপী আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা 35

৩.৭:বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা.....35
৩.৮ আধুনিক শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার অবস্থান.....38
অধ্যায় ৪: ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়.....42
৪.১ মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ধারণা.....42
৪.২ অবক্ষয়ের লক্ষণ.....42
৪.৩ অবক্ষয়ের কারণসমূহ.....43
৪.৩.১ ধর্মীয় শিক্ষার অভাব.....43
৪.৩.২ প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব.....45
৪.৩.৩ পারিবারিক অবহেলা.....47
৪.৩.৪ সাংস্কৃতিক প্রভাব.....48
৪.৪.৪ শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব.....50
৪.৫ সমাজে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব.....52
অধ্যায় ৫: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ও ইসলামি মূল্যবোধ পরিবর্তন.....56
৫.১:পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শনের বৈশিষ্ট্য.....56
৫.২:সেক্যুলারিজম ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রভাব.....57
৫.৩:গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক বৈশ্বিকীকরণ.....58
৫.৪:প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা.....58
৫.৫:শিক্ষা পাঠ্যক্রমে মূল্যবোধগত পরিবর্তন.....59
৫.৬:মুসলিম সমাজে এর প্রতিক্রিয়া ও অভিযোজন.....59
অধ্যায় ৬:অপসংস্কৃতি রোধে ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই.....61
অধ্যায় ৭:মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে শিক্ষা ব্যর্থ কেন?.....67
অধ্যায় ৮: পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান.....74
অধ্যায় ৯:ইসলামি মূল্যবোধের শিক্ষা কেন প্রয়োজন?.....76

অধ্যায় ১০:প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আবশ্যকতা.....81
অধ্যায় ১১: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ। 91
অধ্যায় ১২. ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষায় করণীয় ও সমাধান 96
অধ্যায় ১৩. ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা 101
উপসংহার 106
তথ্যসূত্র:.....107

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

অধ্যায় ১:ভূমিকা

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জন করছে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। তবে এই অগ্রগতির পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে—এই শিক্ষা ব্যবস্থা কি নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে দুর্বল করে দিচ্ছে?

ইসলামি মূল্যবোধ বলতে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ, শালীনতা, এবং আল্লাহভীতি ইত্যাদি গুণাবলীকে বোঝায়, যা একজন মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেকের মতে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব কমে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই মূল্যবোধগুলোর চর্চা কমে যাচ্ছে।

এই গবেষণায় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব এবং ইসলামি মূল্যবোধের সম্ভাব্য অবক্ষয়ের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হবে, পাশাপাশি এই সমস্যার সমাধানের পথও অনুসন্ধান করা হবে।

১.১ গবেষণার পটভূমি

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রযুক্তি, গ্লোবালাইজেশন এবং আধুনিক চিন্তাধারার প্রভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর দক্ষতা ও পেশাভিত্তিক হয়ে উঠেছে। তবে এই পরিবর্তনের ফলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ অনেকাংশে উপেক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে।
ইসলামে শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যম। কুরআনের প্রথম ওহীই ছিল:

“পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আলাক ৯৬:১)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। একই সাথে, ইসলামি শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
অন্যদিকে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত বৈজ্ঞানিক ও পেশাগত দক্ষতার উপর জোর দেয়, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষা উপেক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সততা এবং সামাজিক মূল্যবোধের ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১.২সমস্যা নির্ধারণ

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধের যথাযথ অন্তর্ভুক্তি না থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবার, সমাজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে।
হাদিসে উল্লেখ আছে:

“প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।” (সহিহ বুখারি)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ—সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে সঠিক শিক্ষা নিশ্চিত করার। কিন্তু বাস্তবে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

১.আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা

২.ইসলামি শিক্ষার মূল ধারণা তুলে ধরা

৩.ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ চিহ্নিত করা
৪.শিক্ষার্থীদের উপর এর প্রভাব নির্ণয় করা
৫.একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব প্রদান করা

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন

এই গবেষণায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা হবে:

১.আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে ইসলামি মূল্যবোধকে প্রভাবিত করছে?

২.ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য কী?

৩.মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো কী?

৪.এই অবক্ষয় শিক্ষার্থী ও সমাজে কী প্রভাব ফেলছে?
৫.কীভাবে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব?

১.৫গবেষণার গুরুত্ব

এই গবেষণাটি বর্তমান সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—নৈতিকতা ও মূল্যবোধ—নিয়ে আলোচনা করে।

এটি নীতিনির্ধারক, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।
কুরআনে বলা হয়েছে:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়, সৎকর্ম ও আত্মীয়তার আদেশ দেন...” (সূরা নাহল ১৬:৯০)

এই আয়াত শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

১.৬ গবেষণার পরিধি

এই গবেষণাটি মূলত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ইসলামি মূল্যবোধের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করবে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপর এর প্রভাব বিবেচনা করা হবে।

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

- সীমিত সময় ও তথ্য সংগ্রহের সুযোগ;
- নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর নির্ভরশীলতা;
- কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্যের অভাব।

অধ্যায় ২: ইসলামি শিক্ষার ধারণা

২.১ ইসলামে শিক্ষার সংজ্ঞা:

ইসলামে শিক্ষা (Education) বলতে শুধু তথ্য বা জ্ঞান অর্জন বোঝায় না; বরং এটি মানুষের সার্বিক বিকাশের একটি প্রক্রিয়া, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক উন্নয়ন। ইসলামি দৃষ্টিকোণে শিক্ষা মানুষের জীবনকে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত করার একটি মাধ্যম।
ইসলামে "ইলম" (জ্ঞান) শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জ্ঞান মানুষের আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তাই ইসলামি শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষকে একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলে।

২.২কুরআনের আলোকে শিক্ষা:

শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল উৎস হলেন আল্লাহ। নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের কাছে শিক্ষা ও জ্ঞান পৌঁছে। আল্লাহ হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে। এভাবে বিকশিত বুদ্ধি দ্বারা মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে থাকে। মানুষের সামনে তখন আল্লাহর সৃষ্টি রাজ্যে লুক্কায়িত অনেক রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। অজানা বহু বিষয় সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করে। সে অনেক কিছু আবষ্কিার করে এবং পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলে। অতএব, আল্লাহ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান বলেই মানুষ পৃথিবীকে সুশোভিত, সুসজ্জিত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে।

মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম মানব জাতির আদি পিতা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি রাজ্যের যাবতীয় জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-তরু, আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, বস্তু-পদার্থ প্রভৃতি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর মগজে আল্লাহ সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের বীজ রোপণ করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় আদম সন্তানেরা তাদের আদি পিতার মগজে রোপিত জ্ঞান উত্তরাধিকার

সূত্রে লাভ করে থাকে। বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। আল্লাহর নিকট হতে সরাসরি প্রাপ্ত এ জ্ঞানের কারণেই আদম ও বনী আদম, ফেরেশতামণ্ডলী এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।এ মর্মেই মহান আল্লাহ কালামে পাকে বলেছেন,

﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٣٢ ﴾ [البقرة[٣١، ٣٢ :

“আর তিনি আদমকে নামসমূহ সব শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সুতরাং বললেন, ‘তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’। তারা বলল, ‘আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”(সূরা আল বাকারাহ্ : ৩১-৩২)

তাছাড়া লেখাপড়া বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জনের আদেশ দান করে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেনঃ

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥ كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ٦ ﴾ [العلق[١، ٦ :

“পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।”(সূরা আল ‘আলাক : ১-৫)
এটাই ছিল ইসলামের প্রথম ওহীই নির্দেশনা; জ্ঞান অর্জনের নির্দেশনা।

বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হলেন নবী ও রাসূলগণ। যুগে যুগে মানুষেরা তাঁদের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছে। নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তাঁকে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর শিক্ষাদানের পাঠ্যসূচীও আল্লাহ পাকই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর আয়াতসমূহ

পড়ে শোনানো, তাদেরকে পবিত্র করা এবং কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া। এ মর্মে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়ে বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢ ﴾ [الجمعة[٢ :

"তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।"(সূরা জুম'আ : ২)

[উম্মী দ্বারা তৎকালীন আরবের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।]

লেখাপড়া, বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য কিতাব বা গ্রন্থ অপরিহার্য। তাই মহান আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেনঃ

﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ١ ﴾ [ابراهيم[١ :

এই কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনো, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।"(সূরা ইবরহীম : ১)

নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য লেখাপড়া করা, বিদ্যা শিক্ষা করা এবং জ্ঞান অন্বেষণ করা অপরিহার্য। কেননা এ ছাড়া মানুষের পূর্ণতা লাভের জন্য আর কোনো বিকল্প পথ নেই। সুতরাং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মহান আল্লাহ কালামে পাকে বলেছেন,

﴿يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩ ﴾ [البقرة[٢٦٩ :

‘‘তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করে। আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়। আর বিবেক সম্পন্নগণই উপদেশ গ্রহণ করে।’’(বাকারাহ্ : ২৬৯)
আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্যে। আর ইবাদতের সারবস্তু হলো আল্লাহর ভয়। যাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদত করে। আর যারা জ্ঞানী, কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْ﴾ [فاطر[٢٨ :

‘‘বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।’’(সূরা ফাতির : ২৮)

মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করেছেন। আর সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তিনি বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কুরআন নাযিল করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা বান্দার প্রতি তাঁর অপার করুণার নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছেঃ

﴿عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ ٢ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ ٤﴾ [الرحمن[٢، ٤ :

‘‘(পরম করুণাময়) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা।’’(সূরা আর-রহমান : ২-৪)
যারা বিদ্যা শিক্ষা করে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে কেবল তারাই সৃষ্টি রাজ্যের রহস্য উপলব্ধি করতে পারে। তারা অনেক অজানা বস্তুকে জানতে পারে। আর যারা বিদ্যা শিক্ষা করে না, তারা এ থেকে চির বঞ্চিত। কাজেই বিদ্বান ও মূর্খ কখনও সমান হতে পারে না। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ

﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ ٩﴾ [الزمر[9 :

‘‘বল, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’’(সূরাতুয্ যুমার : ৯)

এই আয়াত জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে এবং শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

যারা শিক্ষা অর্জন করে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাদের সম্মুখে সৃষ্টি রাজ্যের রহস্যাবলীর দ্বার উম্মোচিত হয়। একমাত্র বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এর সন্ধান পেয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছেনঃ

﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٠ ﴾ [ال عمران[١٩٠ :

“নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নিদর্শন।”(সূরা আলে ইমরান : ১৯০)

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفُ أَلۡسِنَتِكُمۡ وَأَلۡوَٰنِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡعَٰلِمِينَ ٢٢ ﴾ [الروم[٢٢ :

“তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।”(সূরা আর্-রূম : ২২)

﴿فَتِلۡكَ بُيُوتُهُمۡ خَاوِيَةَۢ بِمَا ظَلَمُوٓاْۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٥٢ ﴾ [النمل[٥٢ :

“সুতরাং ঐগুলো তাদের বাড়িঘর, যা তাদের যুলমের কারণে বিরান হয়ে আছে। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।”(সূরা আন্-নামল : ৫২)

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءٗ وَٱلۡقَمَرَ نُورٗا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٥ ﴾ [يونس[٥ :

“তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন।”(সূরা ইউনুস : ৫)

মহান আল্লাহ উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিদ্যা শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার পর মানুষকে তিনি জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করারও নির্দেশ দান করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ١١٤ ﴾ [طه[١١٤ :

“আর আপনি বলুন, ‘হে প্রভু! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।”(সূরা ত্বা হা : ১১৪)

কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার পর অনেক শিক্ষার্থী গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করে। এ শ্রেণীর গবেষক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةٗۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ ﴾ [الروم[٢١ :

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা চিন্তা করে।”(সূরা আর্-রূম : ২১)

এছাড়া কুরআনে বারবার চিন্তা, গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামি শিক্ষা কেবল ধর্মীয় জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানকেও উৎসাহিত করে।

২.৩ হাদীসের আলোকে শিক্ষা

শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার পাশাপাশি হাদীসেরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়াও মহান আল্লাহ তাঁকে মানবজাতিকে কিতাব, হিকমত, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর নবুয়তী জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে যেসব বাণী বিধৃত হয়েছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»طلب العلم فريضة على كلّ مسلمٍ«

‘‘জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।’’[ইবনে মাজাহ্, সুনান, ১ম খণ্ড, কিবাতুল ইলম্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।।]
এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষা কেবল একটি অধিকার নয়, বরং একটি ধর্মীয় দায়িত্ব।
আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে:
আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة«

‘‘যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ তাদ্বারা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।’’[আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল্-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ২য় খণ্ড, বাবু ফী তালাবিল ইলম, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯০, পৃ. ২৬২।]
এটি শিক্ষা অর্জনের আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে নির্দেশ করে।
ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেও শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ওহীযোগে আমাকে জানিয়েছেন-

‘‘যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোনো পথ ধরে, আমি তার জন্য বেহেশতের পথ সুগম করে দেই।’’[বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।]

কাসীর ইবনে কায়েস বলেন, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ

»من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنّة«

‘‘যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত করেন।’’[প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।]

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين«

‘‘মহান আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তিনি তাকে দ্বীনের গভীর ‘ইলম দান করেন।’’[বুখারী, সহীহ্, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।]
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع«

‘‘যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহর পথেই চলতে থাকে, যতক্ষণ না ফিরে আসে।’’[.তিরমিযী, জামিউত্-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬। হাদীসটিকে কেউ হাসান বলেছেন, আবার কেউ দুর্বল বলেছেন।]

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

»إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب«

‘‘পূর্ণিমার রাতে নক্ষত্রমালার উপর পূর্ণ চন্দ্রের যেরূপব মর্যাদা, আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ।’’[প্রাগুক্ত]

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দীন ইসলামকে সঞ্জীবিত রাখা, ইবাদতের নিয়ম-কানুন জানা এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ উদ্ধার করা, নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করা এবং অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা বৈধ নয়।কা‘ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّار«

‘‘যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করে যে, আলিমদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, অথবা বোকা ও মূর্খ লোকদের সাথে বিতর্ক করবে এবং লোকদের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।’’[তিরমিযী, জামিউত্ তিরমিযী, ২য় খণ্ড, আবওয়াবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪ ।]

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘‘কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত হবে সেই আলিম, যার ইলমের দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না।’’[দারেমী, সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।]

এছাড়াও জ্ঞানীদের সুউচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء«

“জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি পানির নিচের মাছ। অজ্ঞ ইবাদত গুজারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক সেরকম মর্যাদাবান, যেমন পূর্ণিমার রাতের চাঁদ তারকারাজির উপর দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।”[সুনান আত্-তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৮২।]

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেও শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

২.৪ ইসলামি নৈতিক মূল্যবোধ,

সততা, ধৈর্য, ন্যায়বিচার, পিতামাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান, প্রতিশ্রুতি পালন, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ,আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রাসূল (মুহাম্মদ) ও মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা।

ইসলামি নৈতিক মূল্যবোধ হলো কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে গঠিত সততা, ন্যায়বিচার, দয়া, ধৈর্য ও নম্রতার সমন্বয়ে তৈরি একটি সামগ্রিক আচরণবিধি। এটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আল্লাহভীতি (তাকওয়া) ও পরকালীন জবাবদিহিতার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠন ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

ইসলামি নৈতিকতার মূল ভিত্তি ও উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

মূল ভিত্তি ও উৎস:
কুরআন ও হাদিস: ইসলামি নৈতিকতার মূল উৎস মহান আল্লাহ তাআলার বাণী (কুরআন) এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহ।
তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ): একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কর্ম সম্পাদন করা।
তাকওয়া (আল্লাহভীতি): সর্বদা আল্লাহর নজরদারিতে আছি—এই অনুভূতি রেখে পাপ থেকে বিরত থাকা।

প্রধান নৈতিক গুণাবলী:

সততা ও সত্যবাদিতা: সব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে লেনদেনে সত্য বলা ও আমানত রক্ষা করা।

ন্যায়বিচার (আদল): নিজের বা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে গেলেও ন্যায়ের ওপর অটল থাকা।

দয়া ও সহানুভূতি: মানুষ, পশুপাখি এবং প্রকৃতির প্রতি দয়াপরবশ হওয়া।

ধৈর্য (সবর): বিপদে-আপদে অটল থাকা এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

নম্রতা (তাওয়াজু): অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ী আচরণ করা।

ক্ষমা ও উদারতা: প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা: ওয়াদা বা অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ: রাগের মাথায় খারাপ আচরণ না করা।

সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধ:

পিতামাতার সম্মান: পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ ও তাদের খেদমত করা।

আত্মীয়তার সম্পর্ক: আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

ভ্রাতৃত্ববোধ: সকল মুসলমানকে ভাই ভাই হিসেবে গণ্য করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা করা।

প্রতিবেশীর অধিকার: প্রতিবেশীর খোঁজখবর রাখা ও তাদের কষ্ট না দেওয়া।

ছোট-বড় নির্বিশেষে সম্মান: বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করা।ইসলামি নৈতিকতা কেবল তত্ত্ব নয়, বরং এটি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগযোগ্য একটি সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের চরিত্রকে সর্বোত্তম পর্যায়ে নিয়ে যায়।

ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Values)।

কুরআনে বলা হয়েছে:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়, সৎকর্ম ও আত্মীয়তার আদেশ দেন...” (সূরা নাহল ১৬:৯০)

এই আয়াত নৈতিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ইসলামী নীতিশাস্ত্রে ও নৈতিকতার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো রাযা-ই ইলাহি (আল্লাহর সন্তুষ্টি) অর্জন করা, অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে "মানুষের জীবনের লক্ষ্য" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা;এবং এই প্রসঙ্গে নৈতিক আচরণের গুরুত্ব পাঁচটি কুরআনিক আয়াতে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে মুসলমানদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া হাদিসে মুহাম্মদ (সা.) কে উদ্ধৃত করা হয়েছে, আমি নৈতিকতাকে পূর্ণতা দান করিবার জন্য নবী হইয়া আগমন করিয়াছি।
ইসলামি নৈতিকতার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের চরিত্রকে উন্নত করা, যাতে সে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। তাই ইসলামি শিক্ষা কেবল জ্ঞান প্রদান করে না, বরং সেই জ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার দিকনির্দেশনাও দেয়।

২.৫ চরিত্র গঠনে ইসলামের ভূমিকা

মানব জীবনে চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ তার মনে গ্রোথিত মূল্যবোধ ও গুণাবলীর আলোকেই সম্পাদিত হয়। দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর মতে, মানব মনে যেসব গুণাবলি জাগরিত হয় বাহ্যিক কাজকর্মে তারই প্রতিফলন ঘটে।চরিত্রবান লোককে সমাজের সবাই শ্রদ্ধা করে। এজন্য বলা হয়,

সচ্চরিত্র গঠনের জন্যই যুগে যুগে সংস্কারকরা মানুষের সংশোধন ও পবিত্র জীবন যাপনের পন্থা হিসেবে তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি ও মূল্যবোধের জ্ঞান প্রথমেই শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন, মান-সম্মান ইত্যাদি সব কিছুই তাদের মানসিক বিকাশ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার ওপরই নির্ভর করে।
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

১-

اِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰي يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۭ

আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা তাঁদের ভাগ্যে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে। (সূরা আর-রাদ,আয়াত ১১)

২ -

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا.

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا.

যে নিজেকে (আত্মাকে) শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়”। [শামসঃ ৯-১০]

৩-

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় ”। [আ’লাঃ ১৪]

চারিত্রিক উন্নতি বিকাশকে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। এমনকি তা ইসলামী শিক্ষার অন্যতম একটি কোর্স হিসেবে পরিগণিত করা হয়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ মতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা সমগ্র মানব সমাজের চারিত্রিক উন্নয়নে প্রচুর নির্দেশনা বিদ্যমান। মূলত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এ চরিত্রের আলোকেই হয়ে থাকে। আখলাকের মাধ্যমেই মানুষ মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত মানে উন্নীত হতে পারে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। এ বিধানের পরিপূর্ণতার জন্য তাতে উন্নত চরিত্রের বিধান থাকা আবশ্যক। তাই ইসলামে আখলাকুল হাসানাহ্ তথা উন্নত চরিত্রের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। নিম্নের আলোচনায় তার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হচ্ছে।

আখলাক:

এক- উন্নত আখলাক, যেমনঃ- বিনয়, উদারতা, দয়া, তাকওয়া, সত্যবাদিতা, আহাদ, আমানতদারিতা, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি

দুই- নিন্দনীয় আখলাক, যেমনঃ- হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, অহংকার, নীচতা, হীনতা ইত্যাদি।

এখন মানুষের এই চরিত্রকে সুন্দর করার জন্য তাকে প্রথম প্রকারের গুণাবলী একদিকে যেমন অর্জন করতে হবে অন্যদিকে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবীয় দোষাবলীকে পরিহার করতে হবে। যদি কেউ কেবলমাত্র একটি শ্রেণী অর্জন করতে সমর্থ হয় এবং অন্য

শ্রেণীর গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম না হয় তাহলে সে নিশ্চিতরুপে সচ্চরিত্র গঠনে ব্যর্থ হবে। এরজন্য সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই দুই ধরনের গুণাবলীর নজর দিতে হবে। এখন ইসলাম মানুষের সুন্দর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে কি ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে সেই সম্পর্কে পূর্বে আমাদের জানা উচিৎ।

পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের নিমিত্তে আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কে পৃথিবীতে পাঠানোর অন্যতম কারণ সচ্চরিত্রের বিকাশ সাধন।

চরিত্র গঠন ইসলামি শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। একজন মানুষের প্রকৃত মূল্য তার চরিত্রের উপর নির্ভর করে, এবং ইসলাম এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।
হাদীসে বলা হয়েছে:

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।” (সহিহ বুখারি)

নবী করীম (স.) বলেন:
"আমাকে সচ্চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের নিমিত্তেই পাঠানো হয়েছে।’ একদা জনৈক ব্যক্তি রসূল (স.) কে দ্বীনের সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, ‘উত্তম চরিত্র।’ এ কথা দ্বারা বুঝা যায় উত্তম চরিত্র দ্বীনের অন্যতম একটি রুকন,যা ব্যতীত দ্বীনের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। যেমন হজ সম্পর্কে রাসূলের বাণী: ‘হজের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন হচ্ছে আরাফায় অবস্থান করা, যা ব্যতীত হজ আদায় হয় না, তেমনিভাবে সচ্চরিত্রতা ব্যতীত দ্বীন ও পরিপূর্ণ হয় না। "
রাসূল(সাঃ) আরও বলেন, “উত্তম চরিত্র থেকে মীযানে অধিক উত্তম কোন আমল নেই।”[আবূ দাউদঃ৪১৬৬"

এই হাদীস প্রমাণ করে যে নৈতিকতা ও চরিত্র একজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।

ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়, যা একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়ক।

চরিত্র গঠনে ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং মৌলিক। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের আচার-আচরণ, সততা, বিনয়, দয়া ও নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনই চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ, যা মানুষকে মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

চরিত্র গঠনে ইসলামের মূল ভূমিকাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

■ রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ: ইসলামের মূলনীতি হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্রকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করা, যা মানুষের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়।

■ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ: ইসলাম সততা, বিশ্বস্ততা (আমানত), ধৈর্য, বিনয়, দয়া, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের মতো গুণগুলো অর্জনের শিক্ষা দেয়।

■ ইবাদতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি: সালাত, সিয়াম, জাকাত ও হজ—এই ইবাদতগুলো মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে।

■ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ: ইসলাম সবসময় ভালো কাজের উৎসাহ দেয় এবং মিথ্যা, দুর্নীতি, পরনিন্দা ও অহংকারের মতো খারাপ কাজ পরিহার করতে বলে।

■ ব্যক্তি ও সমাজজীবনের ভারসাম্য: ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত চরিত্র নয়, বরং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অধিকার আদায় এবং সুন্দর আচরণের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।

■ ইসলামি শিক্ষা একজন মানুষকে সততা, নম্রতা, ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়, যা একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়ক।

মূলত, ইসলাম মানুষের ভেতর থেকে "মানবতা" জাগ্রত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উত্তম চরিত্র গঠনের নির্দেশ দেয়।একজন মানুষকে সততা, নম্রতা, ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়, যা একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়ক।

২.৬ ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—এটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, এবং পার্থিব জ্ঞানের সুসমন্বয়। এটি কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং চরিত্র গঠন এবং পরকালীন মুক্তির জন্য আল্লাহভীরু মানুষ তৈরির একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।
ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

- আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার উপর ভিত্তি
- জ্ঞান ও আমলের সমন্বয়
- নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন
- ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা
- ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন

তাওহিদ ও ওহিভিত্তিক: ইসলামি শিক্ষার মূলভিত্তি হলো তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) এবং রিসালাত (নবী-রাসূলের শিক্ষা)। এটি ওহির জ্ঞানের (কুরআন ও হাদিস) আলোকে পার্থিব জ্ঞানকে যাচাই করে।

দীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানের সমন্বয়: এ ব্যবস্থায় দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবিক বিদ্যা শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেন শিক্ষার্থী পার্থিব ও পরকালীন—উভয় জীবনেই কল্যাণ পায়।

নৈতিক ও চরিত্র গঠন: এই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া, যা একজন মানুষকে আদর্শ চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে।
সমগ্র পরিবেশ ইসলামি হওয়া: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, সংস্কৃতি ও কার্যক্রম এমন হয়, যা শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতায় ইসলামি মূল্যবোধ দৃঢ় করে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সুসম্পর্ক: ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা কেবল তথ্য প্রদানকারী নয়, বরং অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে।

বৈশ্বিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি: ইসলামি শিক্ষা বর্ণ, গোত্র বা ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে মানবজাতির কল্যাণে কাজ করে। এটি বৈষম্যহীন ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী।

হৃদয় ও বিবেকের জাগরণ: এই শিক্ষা কেবল মুখস্থ বিদ্যার ওপর জোর দেয় না, বরং চিন্তাশক্তি (আকলি), গবেষণা এবং অন্তর্দৃষ্টি বিকাশে উৎসাহিত করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামি শিক্ষাকে একটি পরিপূর্ণ ও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সংক্ষেপে, ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে দুনিয়াতে সম্মানিত ও সফল এবং আখিরাতে মুক্তি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য করে।

২.৭প্রাচীন ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জ্ঞানার্জনের জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে তেমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কোন মাদরাসা ছিল না। ইসলামের আদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল মসজিদ। এক রেওয়াতে আছে আদম আ. দুনিয়াতে এসে বাইতুল্লাহ বা পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ করেন। এটিই মানব জাতির প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

প্রাচীন ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত জ্ঞানচর্চা, কুরআন-হাদিস ও ইসলামি আইন (ফিকহ) শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, যার সূচনা হয়েছিল মক্কায় রাসূল (সা.)-এর যুগে। প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দারুল আরকাম (প্রথম গোপন কেন্দ্র), মসজিদে নববী, এবং আসহাবে ছুফফাহ (প্রথম আবাসিক মাদ্রাসা) উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে আল-কারাউইন (মরক্কো, ৮৫৯ খ্রি.) এবং আল-আজহার (মিশর, ৯৭০ খ্রি.)-এর মতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাচীনতম ও উল্লেখযোগ্য কিছু ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:দারুল আরকাম (মক্কা): এটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে সাহাবী আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়িতে গোপনে শিক্ষা প্রদান করা হতো।

আখেরী নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম ইসলাম প্রচারের সূচনা থেকেই মানব জাতির মহান শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি ইসলাম শিক্ষার নিয়মনীতি প্রবর্তন করেন। তিনি নবুওয়্যাত লাভের পর কাবাকে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। পরে তিনি মক্কা নগরীর সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আরকাম বিন আবুল আরকামের বাড়িতে ‘দারুল আরকাম’ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তো।
আসহাবে ছুফফাহ (মদিনা): মসজিদে নববীর পাশে অবস্থিত প্রথম আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

আল-কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয় (Morocco): ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতিমা আল-ফিহরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, যা বিশ্বের প্রাচীনতম সক্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (মিশর): ৯৭০-৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয় যুগে প্রতিষ্ঠিত, যা ইসলামি জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।
যাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয় (টিউনিসিয়া): ৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, যা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

নিযামিয়া মাদ্রাসা (বাগদাদ): একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক উজির নিযামুল মুলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, যা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল।
উপমহাদেশের প্রাচীন মাদরাসা:
দারুল উলুম দেওবন্দ (ভারত): ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, যা আধুনিক যুগে দারসে নিজামী পাঠ্যক্রমের জন্য সুপরিচিত।

দারাসবাড়ী মাদ্রাসা (বাংলা): বাংলার প্রাচীন মাদরাসাগুলোর অন্যতম।
শিক্ষার মাধ্যম:প্রাথমিক যুগে মসজিদই ছিল প্রধান কেন্দ্র। এরপর মাদ্রাসাগুলোর মাধ্যমে ফিকহ, হাদিস, তাফসিরের পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করা হতো

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মসজিদ ছিল প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান করা হতো।
পরবর্তীতে মাদ্রাসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা উচ্চতর শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠানে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, দর্শন, গণিত এবং বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হতো।
এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে.

অধ্যায় ৩: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

৩.১আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞা

আধুনিক শিক্ষা এমন একটি গতিশীল ও প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটি কেবল তথ্যভিত্তিক শিক্ষা নয়; বরং শিক্ষার্থীর মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও পেশাগত উন্নয়নকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করে।

শিক্ষাবিদদের মতে, আধুনিক শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী (lifelong learner) হিসেবে গড়ে তোলে এবং তাকে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে।

৩.২ আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বহুমাত্রিক—

প্রথমত, এটি "শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক (Learner-centered)"_এখানে শিক্ষক নির্দেশক (facilitator) হিসেবে কাজ করেন এবং শিক্ষার্থী নিজে শেখার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, "প্রযুক্তিনির্ভরতা"_আধুনিক শিক্ষার একটি মূল দিক। অনলাইন ক্লাস, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষার পরিধি বাড়িয়েছে।

তৃতীয়ত, এটি সমালোচনামূলক চিন্তা (Critical thinking) ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা উন্নয়নে জোর দেয়।

চতুর্থত, "আন্তঃবিষয়ক শিক্ষা (Interdisciplinary learning)"_আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে জ্ঞান অর্জন করা হয়।

পঞ্চমত, "মূল্যায়ন পদ্ধতির বৈচিত্র্য"—শুধু লিখিত পরীক্ষার উপর নির্ভর না করে প্রজেক্ট, প্রেজেন্টেশন ও ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।

৩.৩আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র বইভিত্তিক জ্ঞান প্রদান বা পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান যুগে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো এমন মানুষ তৈরি করা, যারা জ্ঞানী, দক্ষ, সৃজনশীল, মানবিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো—

- **১. শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি:**

আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে সেই জ্ঞান প্রয়োগের দক্ষতা তৈরি করা। শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষা নয়, ব্যবহারিক শিক্ষা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং যোগাযোগ দক্ষতাও আধুনিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসী ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে।

- **২. কর্মসংস্থান উপযোগী মানবসম্পদ তৈরি:**

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক শিক্ষা এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যাতে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে চাকরি, ব্যবসা বা উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হতে পারে। কারিগরি শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

- **৩. সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি:**

আধুনিক শিক্ষা মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতার ওপর গুরুত্ব দেয়। শিক্ষার্থীদের নতুন ধারণা সৃষ্টি, গবেষণা, উদ্ভাবন ও সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা হয়। এর ফলে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে এবং নতুন কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবনে আগ্রহী হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির পেছনে এই সৃজনশীল শিক্ষার বড় ভূমিকা রয়েছে।

- **৪. সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলা:**

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে। আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সত্যবাদিতা, দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। এর ফলে তারা সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে শেখে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

- **৫. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি:**

আধুনিক শিক্ষা মানুষকে স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক আচরণ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের মতামতের মূল্য বুঝতে শেখে। এর মাধ্যমে একজন সচেতন নাগরিক তৈরি হয়, যে রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

- **৬. বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন:**

বর্তমান বিশ্ব একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে। তাই আধুনিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের জ্ঞান ও দক্ষতায় দক্ষ করে

তোলা। তথ্যপ্রযুক্তি, ইংরেজি ভাষা, গবেষণা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করে।

- **৭. প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন**

ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার, ইন্টারনেট, অনলাইন শিক্ষা ও ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করে। এর ফলে তারা প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে সহজে মানিয়ে নিতে পারে।

- **৮. ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ:**

আধুনিক শিক্ষা মানুষের মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়তা করে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, বিতর্ক, নেতৃত্বদান ও দলগত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী মানুষে পরিণত হয়।

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল ডিগ্রি অর্জন নয়; বরং একজন মানুষকে যোগ্য, দক্ষ, সৃজনশীল, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে আধুনিক শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সময়ের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

৩.৪: আধুনিক শিক্ষার ইতিবাচক দিক

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে—

একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ‘জ্ঞানপ্রাপ্তির সহজলভ্যতা’। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এটি দক্ষতা উন্নয়ন সহায়ক। প্রযুক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে সফল হতে পারে।

তৃতীয়ত, সামাজিক অগ্রগতি। আধুনিক শিক্ষা সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

চতুর্থত, নারী শিক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা—আধুনিক শিক্ষা নারীদের এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চমত, উদ্ভাবন ও গবেষণা—নতুন প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৫: আধুনিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা

যদিও আধুনিক শিক্ষা অনেক উন্নতি সাধন করেছে, তবে কিছু সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট—

প্রথমত, নৈতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার ঘাটতি। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করলেও নৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা ও মানসিক চাপ ;শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ, হতাশা ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করছে।

তৃতীয়ত, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ—শিক্ষা একটি পণ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় অনেক সময় মানের পরিবর্তে লাভের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

চতুর্থত, সংস্কৃতিগত ও ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা—শিক্ষার্থীরা নিজেদের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যেতে পারে।

পঞ্চমত, প্রযুক্তির অপব্যবহার—সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি ও সময় অপচয় শিক্ষার ক্ষতি করছে।

৩.৬ বিশ্বব্যাপী আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে হলেও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর গবেষণাভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর। সেখানে শিক্ষার্থীদের বাস্তব সমস্যার সমাধানে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়।

অনেক দেশে STEM শিক্ষা(Science, Technology, Engineering, Mathematics) বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

এছাড়া, অনলাইন শিক্ষা ও দূরশিক্ষা (distance learning) বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে।

৩.৭:বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত ও প্রযুক্তিনির্ভর রূপ লাভ করছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নানা ধরনের সংস্কার, নীতিমালা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার মান উন্নয়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত। এগুলো হলো—

১. সাধারণ শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষা দেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষা ধারা। এটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে পরিচালিত হয়। এই ধারায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন সাধারণ বিষয় পড়ানো হয়। সাধারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মৌলিক জ্ঞান প্রদান এবং উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা।

বর্তমানে সাধারণ শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ডিজিটাল কনটেন্ট ও অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আধুনিক ও সহজ পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

২. মাদ্রাসা শিক্ষা

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ধারা। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাও প্রদান করা হয়। বর্তমানে আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তির মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও আধুনিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষা ও চাকরিক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারছে।

৩. কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা

কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ধারায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা শেখানো হয়। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এই শিক্ষা প্রদান করা হয়।

কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে। এর ফলে তারা সহজে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশ সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" উদ্যোগের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন—

- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম
- অনলাইন ক্লাস ও ভার্চুয়াল শিক্ষা
- ই-বুক ও ডিজিটাল কনটেন্ট
- শিক্ষা বিষয়ক মোবাইল অ্যাপ

- অনলাইন পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশ

বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ

যদিও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন হয়েছে, তবুও বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান।

১. শহর ও গ্রামের শিক্ষার মানের পার্থক্য

শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকলেও গ্রামের অনেক বিদ্যালয়ে এখনো পর্যাপ্ত প্রযুক্তি, দক্ষ শিক্ষক ও মানসম্মত শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে। ফলে শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার মানে বৈষম্য দেখা যায়।

২. প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব

মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক সংকট একটি বড় সমস্যা।

৩. অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

অনেক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা নেই। গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও প্রযুক্তিগত সমস্যাও শিক্ষার উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে।

৪. পরীক্ষামুখী শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো মুখস্থবিদ্যা ও পরীক্ষার ফলাফলের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, গবেষণামূলক চিন্তা ও ব্যবহারিক দক্ষতা পর্যাপ্তভাবে বিকশিত হয় না। আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষমতা তৈরি করা।

৫. প্রযুক্তিগত বৈষম্য

সব শিক্ষার্থী সমানভাবে প্রযুক্তির সুবিধা পায় না। অনেক দরিদ্র পরিবারে স্মার্টফোন, কম্পিউটার বা ইন্টারনেট সংযোগের অভাব রয়েছে। এর ফলে অনলাইন শিক্ষায় অনেক শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষানীতির সংস্কার এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। তবে শিক্ষার মান উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পরীক্ষামুখী শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসা এখন সময়ের দাবি। সরকার, শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি আধুনিক, দক্ষ ও মানবিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

৩.৮ আধুনিক শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার অবস্থান

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আধুনিক জ্ঞান অর্জন করে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করছে। তবে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; একজন আদর্শ মানুষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তুলতেও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে আধুনিক শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

নৈতিক শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন, মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং সৎ ও দায়িত্বশীল আচরণ শেখাতে সহায়তা করে। সত্যবাদিতা, সততা, শৃঙ্খলা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, মানবতা ও পারস্পরিক সম্মানবোধ নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আধুনিক সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও এর বাস্তব প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অধিকাংশ সময় তা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার জন্য নৈতিক শিক্ষা পড়ে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সেই মূল্যবোধের চর্চা সবসময় দেখা যায় না। ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আংশিকভাবে ব্যাহত হয়।

আধুনিক সমাজে প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার নৈতিক শিক্ষার কার্যকারিতার ওপর প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে শিশু ও তরুণদের একটি বড় অংশ দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইন্টারনেট ব্যবহারে ব্যস্ত থাকে। এর ফলে তারা বাস্তব

সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে অনেক সময় দূরে সরে যাচ্ছে। অনলাইনে নেতিবাচক বিষয়বস্তুর প্রভাবও শিক্ষার্থীদের আচরণ ও চিন্তাধারায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

এছাড়াও পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় নৈতিক শিক্ষার দুর্বলতার একটি বড় কারণ। পরিবার শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। পরিবারে যদি সততা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা কমে যায়, তাহলে শিশুর নৈতিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাত্রা, সামাজিক পরিবর্তন এবং ভোগবাদী মানসিকতার কারণে অনেক পরিবারে সন্তানদের নৈতিক শিক্ষার প্রতি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণেও নৈতিক শিক্ষার কার্যকারিতা কিছুটা হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক সমাজে অনেক সময় মানুষ সাফল্য অর্জনের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ উপেক্ষা করে। দুর্নীতি, অসততা, সহিংসতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের মতো সমস্যাগুলো তরুণদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে নৈতিক শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়।

এই পরিস্থিতিতে আধুনিক শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষাকে আরও কার্যকর ও বাস্তবমুখী করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. পাঠ্যক্রমে ব্যবহারিক নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা

নৈতিক শিক্ষাকে শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। দলগত কাজ, সামাজিক সেবা, সহানুভূতিমূলক কার্যক্রম, পরিবেশ রক্ষা ও মানবিক আচরণের চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো যেতে পারে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমেও নৈতিক শিক্ষা কার্যকর করা সম্ভব।

২. শিক্ষক ও অভিভাবকদের সক্রিয় ভূমিকা

শিক্ষার্থীদের নৈতিক বিকাশে শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা যদি নিজেদের আচরণের মাধ্যমে সততা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের উদাহরণ সৃষ্টি করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা সহজেই তা অনুসরণ করবে। একইভাবে পরিবারেও সন্তানদের নৈতিক মূল্যবোধ শেখাতে অভিভাবকদের সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমন্বয়

নৈতিক শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী করতে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমন্বয় প্রয়োজন। ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্ম মানুষকে সততা, মানবতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সহানুভূতির শিক্ষা দেয়। একই সঙ্গে দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধও

শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আধুনিক শিক্ষায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৪. প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করা

প্রযুক্তিকে নৈতিক শিক্ষার সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষামূলক ভিডিও, অনলাইন নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং ইতিবাচক ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষার্থীদের ভালো মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করতে পারে। পাশাপাশি প্রযুক্তির অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করাও জরুরি।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতি বর্তমান সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। শুধুমাত্র প্রযুক্তিনির্ভর বা পরীক্ষামুখী শিক্ষা একটি আদর্শ সমাজ গঠন করতে পারে না।

তাই এমন একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি নৈতিকতা, মানবিকতা এবং ইসলামি মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু দক্ষ নয়, বরং সৎ, দায়িত্বশীল ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।

অধ্যায় ৪: ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়

৪.১ মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ধারণা

মূল্যবোধ অবক্ষয় বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ ধীরে ধীরে নৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবোধ অবক্ষয় হলো সেই অবস্থা, যখন মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসরণ থেকে দূরে সরে যায় এবং পার্থিব আকর্ষণ ও ভোগবাদী চিন্তায় বেশি প্রভাবিত হয়।

এটি একটি ধীরগতির কিন্তু গভীর সামাজিক সমস্যা, যা ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে।

৪.২ অবক্ষয়ের লক্ষণ

ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কিছু সুস্পষ্ট লক্ষণ সমাজে পরিলক্ষিত হয়—

- ধর্মীয় অনুশীলনে অনীহা (নামাজ, রোজা ইত্যাদিতে অবহেলা)
- সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্ববোধের হ্রাস
- অসততা, দুর্নীতি ও প্রতারণার প্রবণতা বৃদ্ধি
- সামাজিক শৃঙ্খলার অবনতি
- বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি অসম্মান
- অশালীনতা ও অসংযমী আচরণের বিস্তার
- আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদী মানসিকতার বৃদ্ধি

এসব লক্ষণ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের মধ্যে নৈতিক সংকটের ইঙ্গিত বহন করে।

৪.৩ অবক্ষয়ের কারণসমূহ

৪.৩.১ ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। ধর্ম মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়
জীবনের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব অনেকাংশে কমে যাওয়ার ফলে মানুষের নৈতিক চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সমাজে বিভিন্ন ধরনের অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষাকে মূল শিক্ষার তুলনায় কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষায় যতটা গুরুত্ব দেয়, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় ততটা গুরুত্ব দেয় না। ফলে তারা ইসলামি মূল্যবোধ, আদর্শ ও নৈতিকতার শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী কুরআন, হাদিস ও ইসলামি জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। এর ফলে তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে মানুষ সঠিক ও ভুলের পার্থক্য নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হয়। ধর্ম মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, ধৈর্য ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। কিন্তু যখন এসব শিক্ষার অভাব ঘটে, তখন মানুষের মধ্যে মিথ্যা বলা, প্রতারণা, দুর্নীতি, হিংসা, স্বার্থপরতা ও অসততার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সমাজে অন্যায় কাজকে অনেকেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শুরু করে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে সহজেই খারাপ সঙ্গ, মাদকাসক্তি, অশ্লীলতা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তারের ফলে তরুণরা বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। যদি তাদের মধ্যে শক্ত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা না থাকে, তবে তারা সহজেই নেতিবাচক বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় তারা স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করে এবং সীমাহীন ভোগবাদী জীবনধারার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ কমে যায় এবং নৈতিক মূল্যবোধ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।

ধর্মীয় শিক্ষার অভাব মানুষের আত্মিক শান্তিকেও নষ্ট করে। ধর্ম মানুষকে ধৈর্য, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয়। একজন ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি জানে যে প্রতিটি কাজের জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এই বিশ্বাস মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে অনেক মানুষ কেবল পার্থিব লাভ-ক্ষতির চিন্তায় পরিচালিত হয় এবং নৈতিকতা বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না।

এ ছাড়া পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশ দুর্বল হয়ে যাওয়াও একটি বড় সমস্যা। অনেক অভিভাবক সন্তানদের আধুনিক শিক্ষায় গুরুত্ব দিলেও নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেন না। ফলে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধের সঠিক শিক্ষা পায় না। পরিবার থেকে ধর্মীয় অনুশাসনের চর্চা কমে গেলে সমাজেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

অতএব, নৈতিক অবক্ষয় রোধে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সকল স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার যথাযথ চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কুরআন-হাদিসের শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করতে হবে। তাহলেই একটি সুশৃঙ্খল, নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৪.৩.২ প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব

বর্তমান যুগকে প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ, দ্রুত ও আধুনিক করে তুলেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কিন্তু প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের পাশাপাশি এর অপব্যবহারও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সমাজে নৈতিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
প্রযুক্তি আধুনিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও এর অপব্যবহার মূল্যবোধ অবক্ষয়ের একটি বড় কারণ।

- সোশ্যাল মিডিয়ায় অশালীন ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট
- সময়ের অপচয়
- বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা
- অনুকরণ প্রবণতা (Western lifestyle imitation)

এসব কারণে তরুণ প্রজন্মের চিন্তাভাবনা ও আচরণে নেতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:
বর্তমানে তরুণ সমাজের একটি বড় অংশ দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক সময় অশালীন, বিভ্রান্তিকর ও অনৈতিক কনটেন্ট সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। এসব কনটেন্ট তরুণদের মন-মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেকেই বিনোদনের নামে এমন বিষয় অনুসরণ করতে শুরু করে, যা তাদের নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে দেয়। অশ্লীলতা, হিংসাত্মক ভিডিও, মিথ্যা তথ্য ও অপসংস্কৃতির প্রভাব ধীরে ধীরে তাদের চিন্তাধারা ও আচরণে পরিবর্তন এনে দেয়।
প্রযুক্তির আরেকটি বড় নেতিবাচক দিক হলো সময়ের অপচয়। অনেক তরুণ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যয় করে। তারা পড়াশোনা, সৃজনশীল কাজ ও পারিবারিক দায়িত্বের পরিবর্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনলাইনে কাটায়।

এর ফলে তাদের মনোযোগ ও কর্মক্ষমতা কমে যায়। ধীরে ধীরে তারা অলসতা ও দায়িত্বহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং বাস্তব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়।

সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানুষ বাস্তব জীবনের সম্পর্কের চেয়ে ভার্চুয়াল জগতে বেশি সময় কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবারে পারস্পরিক যোগাযোগ কমে যাচ্ছে এবং আত্মীয়তা ও মানবিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে। অনেক তরুণ একাকীত্ব, হতাশা ও মানসিক চাপে ভুগছে, কারণ তারা বাস্তব জীবনের চেয়ে অনলাইন জীবনের প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

এ ছাড়া পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের একটি বড় কারণ। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণরা বিদেশি সংস্কৃতি ও জীবনধারার দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হচ্ছে। অনেকেই নিজের সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে পশ্চিমা জীবনধারাকে আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করছে। পোশাক, ভাষা, আচরণ ও জীবনযাপনে অন্ধ অনুকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার মানুষের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও অসহিষ্ণুতাও বৃদ্ধি করছে। অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য মিথ্যা তথ্য প্রচার, অন্যকে অপমান বা নেতিবাচক মন্তব্য করতে দ্বিধা করে না। অনলাইনে সাইবার বুলিং, প্রতারণা ও গুজব ছড়ানোর ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সমাজে অস্থিরতা ও নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করছে।

তবে প্রযুক্তি নিজে খারাপ নয়; এর সঠিক ব্যবহারই গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তিকে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা, গবেষণা ও মানবকল্যাণের কাজে ব্যবহার করলে সমাজ উপকৃত হতে পারে। তাই তরুণ সমাজকে প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে তারা প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে বিরত থেকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

৪.৩.৩ পারিবারিক অবহেলা

পরিবার হলো মানুষের জীবনের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং নৈতিক শিক্ষা অর্জনের প্রধান কেন্দ্র। একটি শিশু জন্মের পর প্রথমে পরিবার থেকেই ভাষা, আচরণ, শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করে। বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আচরণ, কথা ও জীবনযাপন শিশুর চরিত্র গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। তাই একটি আদর্শ পরিবার একটি আদর্শ সমাজ গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে পারিবারিক অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে শিশু ও তরুণদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ অভিভাবক জীবিকা নির্বাহ ও পেশাগত ব্যস্ততার কারণে সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। অনেক বাবা-মা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকেন, ফলে সন্তানদের মানসিক অবস্থা, বন্ধুবান্ধব বা দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পর্কে তারা সঠিকভাবে খোঁজ নিতে পারেন না। সন্তানরা কী দেখছে, কী শিখছে বা কার সঙ্গে মিশছে—এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত নজরদারির অভাব দেখা যায়। ফলে শিশুরা ধীরে ধীরে পরিবারের স্নেহ, দিকনির্দেশনা ও নৈতিক শিক্ষার অভাব অনুভব করে এবং বাইরের নেতিবাচক পরিবেশের প্রভাবে সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

সন্তানদের সঙ্গে সময় না কাটানোর কারণে পরিবারে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শিশুরা যখন বাবা-মায়ের কাছ থেকে ভালোবাসা, পরামর্শ ও সহানুভূতি পায় না, তখন তারা অন্য জায়গায় মানসিক আশ্রয় খুঁজতে শুরু করে। অনেক সময় তারা অতিরিক্তভাবে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট বা খারাপ বন্ধুর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে এবং মাদকাসক্তি, অসামাজিক কার্যকলাপ বা অপরাধমূলক আচরণের দিকে ঝুঁকে যেতে পারে।

পরিবারে ধর্মীয় অনুশীলনের অভাবও নৈতিক অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অনেক পরিবারে নিয়মিত নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, ধর্মীয় আলোচনা বা নৈতিক শিক্ষার চর্চা কমে গেছে। ফলে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা পায় না। তারা আল্লাহভীতি, সততা, সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার মতো গুণাবলি অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ না থাকলে শিশুদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নৈতিক সচেতনতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ ছাড়া বর্তমান সমাজে অনেক পরিবারে দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক অশান্তি ও বিচ্ছেদের ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্ত পরিবেশ শিশুদের মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তারা হতাশ, রাগান্বিত ও মানসিকভাবে অস্থির হয়ে ওঠে। অনেক সময় এই মানসিক চাপ তাদের আচরণে নেতিবাচক পরিবর্তন আনে এবং তারা আক্রমণাত্মক বা অসামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

অভিভাবকদের অসচেতনতা ও অতিরিক্ত শাসনও অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে। কিছু পরিবারে সন্তানদের প্রতি অতিরিক্ত কঠোরতা দেখানো হয়, আবার কোথাও অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই শিশুর সঠিক চরিত্র গঠন ব্যাহত হতে পারে। শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী স্নেহ, শাসন ও দিকনির্দেশনার সমন্বয় না থাকলে তারা সঠিক মূল্যবোধ অর্জনে ব্যর্থ হয়।

বর্তমানে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিশুদের সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রও সংকুচিত হয়ে গেছে। আগে দাদা-দাদি, নানা-নানি ও পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের কাছ থেকে শিশুরা নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক আচরণ ও জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করত। কিন্তু এখন সেই সুযোগ কমে যাওয়ায় অনেক শিশু পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অতএব, পারিবারিক অবহেলা নৈতিক অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে তুলতে হলে পরিবারকে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের সময় দেওয়া, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করা। কারণ একটি আদর্শ পরিবারই পারে একজন আদর্শ মানুষ এবং একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে।

৪.৩.৪ সাংস্কৃতিক প্রভাব

বর্তমান বিশ্বে গ্লোবালাইজেশন, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তারের ফলে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির মধ্যে ব্যাপক বিনিময় ঘটছে। মানুষ এখন খুব সহজেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জীবনধারা, পোশাক, ভাষা, বিনোদন ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। সাংস্কৃতিক বিনিময় অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক

ভূমিকা পালন করলেও এর নেতিবাচক প্রভাবও সমাজে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বিদেশি সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ তরুণ সমাজের মধ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশি সংস্কৃতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তরুণরা এসব মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তে বিদেশি জীবনধারাকে আধুনিকতা ও উন্নত জীবনের প্রতীক হিসেবে মনে করছে। ফলে তারা ধীরে ধীরে নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিচয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে অশালীন পোশাক ও আচরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম শালীনতা, সংযম ও পরিমিতিবোধের শিক্ষা দেয়। কিন্তু অনেক বিদেশি সংস্কৃতিতে উন্মুক্ত ও অশালীন পোশাক, অবাধ মেলামেশা ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনকে উৎসাহিত করা হয়। তরুণ সমাজ এসব বিষয়কে অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক সময় ইসলামি আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করছে। এর ফলে সমাজে লজ্জাশীলতা, ভদ্রতা ও শালীনতার চর্চা কমে যাচ্ছে।

এ ছাড়া ভোগবাদী জীবনধারার প্রসারও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক মানুষ এখন বিলাসিতা, ফ্যাশন, বাহ্যিক চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করছে। মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য অতিরিক্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। এর ফলে আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংকার ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ নৈতিকতা ও মানবিকতার চেয়ে অর্থ ও ভোগবিলাসকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

বিদেশি সংস্কৃতির আরেকটি নেতিবাচক প্রভাব হলো ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধি পাওয়া। অনেক তরুণ ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক রীতি-নীতি ও পারিবারিক মূল্যবোধকে সেকেলে বা অপ্রয়োজনীয় মনে করতে শুরু করেছে। তারা মনে করে আধুনিক হতে হলে ধর্মীয় বিধান ও ঐতিহ্য থেকে দূরে থাকতে হবে। এর ফলে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক চর্চার প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আল্লাহভীতি, দায়িত্ববোধ ও আত্মসংযমের মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি দুর্বল হয়ে পড়ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলা সংস্কৃতির অনেক ইতিবাচক দিক—যেমন পারিবারিক বন্ধন, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা,

সামাজিক সংহতি ও সৌজন্যবোধ—ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তরুণরা নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি অতিরিক্ত আকৃষ্ট হচ্ছে। এর ফলে সমাজে সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি ও পরিচয়ের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।
এ ছাড়া বিনোদনের নামে অনেক বিদেশি সংস্কৃতিতে সহিংসতা, অবাধ সম্পর্ক, মাদকাসক্তি ও অনৈতিক আচরণকে স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। তরুণরা যখন এসব বিষয় নিয়মিত দেখে, তখন তাদের চিন্তাভাবনা ও আচরণেও নেতিবাচক পরিবর্তন আসে। অনেক সময় তারা বাস্তব জীবনেও এসব আচরণ অনুকরণ করার চেষ্টা করে, যা সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি করে।
তবে সব বিদেশি সংস্কৃতি খারাপ নয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা ও মানবকল্যাণমূলক বিষয়গুলো গ্রহণ করা ইতিবাচক। কিন্তু কোনো সংস্কৃতি গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও জাতীয় ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তরুণ সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝে ইতিবাচক বিষয় গ্রহণ করতে পারে এবং ইসলামি মূল্যবোধ ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করতে সক্ষম হয়।
অতএব, সাংস্কৃতিক প্রভাব নৈতিক অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই সমস্যা মোকাবিলায় পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও গণমাধ্যমকে সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে। তরুণদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করতে পারলেই একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৪.৪.৪ শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব

ইসলামি মূল্যবোধ মানুষের চরিত্র গঠন, নৈতিক উন্নয়ন এবং সুশৃঙ্খল জীবন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন শিক্ষার্থীর জীবনে সততা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, আত্মসংযম, মানবিকতা ও পরিশ্রমের মতো গুণাবলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইসলামি মূল্যবোধ এসব গুণ অর্জনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে শিক্ষার্থীদের জীবন ও আচরণে নানা ধরনের নেতিবাচক

প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এর ফলে তারা আদর্শ ও সুশিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অন্যতম বড় প্রভাব হলো নৈতিক অবক্ষয় ও চরিত্রের দুর্বলতা। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে সততা, ভদ্রতা, শ্রদ্ধাবোধ ও দায়িত্ববোধ কমে যাচ্ছে। তারা সহজেই মিথ্যা বলা, প্রতারণা, অসদাচরণ ও অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ছে। শিক্ষক, অভিভাবক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রবণতাও কমে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক গুণাবলি দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সমাজে নৈতিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষার প্রতি অনীহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং শিক্ষাকে ইবাদতের মর্যাদা প্রদান করেছে। কিন্তু মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে। তারা সময়ের মূল্য বুঝতে পারছে না এবং মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন গেম বা অপ্রয়োজনীয় বিনোদনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করছে। এর ফলে তাদের শিক্ষাজীবনে ব্যর্থতা, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাবও শিক্ষার্থীদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ইসলাম মানুষকে সংযম, ধৈর্য ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয়। কিন্তু ইসলামি মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে অনেক শিক্ষার্থী নিজেদের আবেগ ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তারা সহজেই রাগ, হিংসা, হতাশা বা খারাপ সঙ্গের প্রভাবে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আত্মসংযমের অভাবে তারা অনেক সময় অসামাজিক ও অনৈতিক আচরণে জড়িয়ে পড়ে।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে কিছু শিক্ষার্থী অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডেও জড়িয়ে পড়ছে। মাদকাসক্তি, সাইবার অপরাধ, চুরি, সহিংসতা, কিশোর গ্যাং সংস্কৃতি ও বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা বর্তমানে উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবার ও সমাজ থেকে সঠিক নৈতিক দিকনির্দেশনা না পাওয়ার কারণে তারা সহজেই নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হয়। অনেক সময় বন্ধুবান্ধবের চাপ বা খারাপ পরিবেশ তাদের অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। এর ফলে তাদের ব্যক্তিগত জীবন যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি সমাজেও অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায়।

ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বর্তমান সময়ে অনেক শিক্ষার্থী মানসিক অস্থিরতা, উদ্বেগ, হতাশা ও একাকীত্বে ভুগছে। ধর্মীয় অনুশীলন ও আত্মিক চর্চা মানুষের মনে শান্তি ও স্থিরতা এনে দেয়। কিন্তু যখন শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যায়, তখন তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার, প্রতিযোগিতামূলক জীবন এবং পারিবারিক অবহেলাও তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে।

এ ছাড়া মূল্যবোধের অভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বহীনতা ও শৃঙ্খলাহীনতা বৃদ্ধি পায়। তারা নিয়ম-কানুন মেনে চলতে অনীহা প্রকাশ করে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় তারা শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে, যা শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করে দেয়।

একজন শিক্ষার্থীই ভবিষ্যতের নাগরিক ও দেশের সম্পদ। তাই তাদের নৈতিক ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামি মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের জীবনে সততা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, আত্মসংযম ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এজন্য পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজকে একযোগে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক চর্চা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারলে তারা সুশিক্ষিত, দায়িত্বশীল ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

৪.৫ সমাজে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

ইসলামি মূল্যবোধ একটি সমাজের নৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলাম মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিকতা, দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সম্মানের শিক্ষা দেয়। এসব মূল্যবোধ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু যখন সমাজ থেকে ইসলামি মূল্যবোধ ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে শুরু করে, তখন তার দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে দেখা যায়। ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র ও সামগ্রিক সামাজিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সমাজে নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়।

ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অন্যতম বড় প্রভাব হলো দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রসার। যখন মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি, সততা ও জবাবদিহিতার অনুভূতি কমে যায়, তখন তারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করে। এর ফলে ঘুষ, প্রতারণা, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অসততা সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ ন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায়কে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্নীতির কারণে সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়।

সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলাও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের একটি বড় পরিণতি। ইসলাম সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। কিন্তু যখন মানুষ নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যায়, তখন হিংসা, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়। মানুষ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলে এবং সমাজে সংঘাত ও বিভাজন সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক সহিংসতা, সামাজিক বিরোধ, প্রতিহিংসা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়ে সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে দেয়।

পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব। পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি, আর ইসলাম পরিবারকে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্মানের মাধ্যমে পরিচালনার শিক্ষা দেয়। কিন্তু ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে পরিবারে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ কমে যাচ্ছে। বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে, দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিচ্ছেদের ঘটনাও বাড়ছে। এর ফলে শিশুদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে এবং সমাজে অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিও সমাজে মূল্যবোধ অবক্ষয়ের একটি ভয়াবহ প্রভাব। যখন নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন মানুষ সহজেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকে যায়। চুরি, ডাকাতি, মাদকাসক্তি, হত্যাকাণ্ড, যৌন অপরাধ, সাইবার অপরাধ ও কিশোর অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে তরুণ সমাজ যদি সঠিক নৈতিক শিক্ষা না পায়, তবে তারা সহজেই খারাপ সঙ্গ ও অপরাধচক্রের প্রভাবে বিপথগামী হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

নেতৃত্বের সংকটও ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল। একটি সমাজের উন্নতির জন্য সৎ, যোগ্য ও নৈতিক নেতৃত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু যখন

সমাজে নৈতিকতার অভাব দেখা দেয়, তখন সৎ ও আদর্শবান নেতৃত্বের পরিবর্তে অসৎ, স্বার্থপর ও দায়িত্বহীন ব্যক্তিরা নেতৃত্বের অবস্থানে চলে আসে। তারা ব্যক্তিগত লাভ ও ক্ষমতার অপব্যবহারে বেশি মনোযোগ দেয়, ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। নৈতিক নেতৃত্বের অভাবে জনগণের মধ্যে আস্থাহীনতা ও হতাশা সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়া ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নকেও ব্যাহত করে। একটি নৈতিকভাবে দুর্বল সমাজে মানুষ দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে আগ্রহী হয় না। কর্মক্ষেত্রে অসততা, অবহেলা ও অনিয়ম বৃদ্ধি পায়, যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা সৃষ্টি করে। টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুশাসন, ন্যায়বিচার, মানবিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা—যা ইসলামি মূল্যবোধের মাধ্যমেই শক্তিশালী হয়। কিন্তু মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এসব গুণাবলি দুর্বল হয়ে পড়লে সমাজ দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় মানুষের মানসিক ও আত্মিক জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানুষ আত্মিক শান্তি হারিয়ে ফেলে এবং হতাশা, উদ্বেগ ও অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। সমাজে মানবিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এর ফলে সামাজিক সংহতি নষ্ট হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতা ও বিভাজন বৃদ্ধি পায়।

অতএব, ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ভয়াবহ। একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে হলে ইসলামি নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করা অত্যন্ত জরুরি। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংগঠন, গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে, যাতে সমাজে নৈতিকতা, সততা ও দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলেই একটি সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সারসংক্ষেপ:

ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা, যার পেছনে শিক্ষা, পরিবার, সমাজ ও প্রযুক্তির প্রভাব বিদ্যমান।

এই অবক্ষয় রোধে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ—যেখানে আধুনিক শিক্ষার সাথে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

অধ্যায় ৫: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ও ইসলামি মূল্যবোধ পরিবর্তন

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা আর কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জ্ঞান, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এখন বৈশ্বিকভাবে আদান-প্রদান হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, দর্শন ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে। এর ফলে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ইসলামি মূল্যবোধের সাথে কিছু ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব, আবার কিছু ক্ষেত্রে অভিযোজন লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে সেই প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণ করা হবে।

৫.১:পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শনের বৈশিষ্ট্য

পাশ্চাত্য শিক্ষা মূলত যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক মনোভাব, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে জাগতিক জ্ঞান ও দক্ষতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তবমুখী ও প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা অর্জন করলেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকটি অনেক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে।

John Dewey-এর মতানুসারে শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা, যা বাস্তবজীবনের সমস্যার সমাধানে সহায়ক।

তবে ইসলামি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো নৈতিক চরিত্র গঠন ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি।

হাদীস বলা হয়েছে:

> “নিশ্চয়ই আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র পূর্ণ করার জন্য।”
> — (মুসনাদ আহমদ)

এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামি শিক্ষায় নৈতিকতা একটি কেন্দ্রীয় বিষয় এবং আধুনিক শিক্ষায় ক্যারিয়ার গঠন কেন্দ্রীয় বিষয়।

৫.২:সেক্যুলারিজম ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রভাব

সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যেখানে ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রাখা হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পৃথক রাখা হয়। এর ফলে শিক্ষা হয় ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে নিরপেক্ষ।

তবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং নৈতিকতা, চরিত্র গঠন ও আল্লাহভীতির বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তাই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় চর্চা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কুরআন বলা হয়েছে:

> “তোমরা কি কিতাবের একাংশে বিশ্বাস করো এবং অন্য অংশ অস্বীকার করো?”
> — (সূরা আল-বাকারা ২:৮৫)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী ব্যবস্থা। জীবনের প্রত্যেকটা বিষয় নিয়েই ইসলামে রয়েছে সঠিক পথ নির্দেশনা। কিন্তু আধুনিকতা ইসলামে শুধু ব্যক্তি জীবনে অর্থ্যাৎ নামাজ, রোজা,ইদ এমন কয়েকটি আচার আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং বাকি সকল ক্ষেত্রে মানবরচিত নিয়ম কানুন অর্থ্যাৎ সেকুলারিজমের(ধর্মনিরপেক্ষতা) এর প্রভাব বিদ্যমান।

৫.৩:গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক বৈশ্বিকীকরণ

গণমাধ্যম ও বৈশ্বিকীকরণের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জীবনধারা, পোশাক, আচরণ ও মূল্যবোধ সহজেই তরুণ সমাজে প্রভাব ফেলছে।

UNESCO-এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক প্রবাহ স্থানীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে পরিবর্তন আনতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে অনেক সময় ইসলামি সংস্কৃতির সরলতা, শালীনতা ও সংযমের মতো মূল্যবোধ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।

৫.৪:প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা

প্রযুক্তি আধুনিক শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ। প্রযুক্তি আধুনিক শিক্ষাকে সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করেছে। অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল রিসোর্স এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।তবে এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শিক্ষার্থীদের আচরণ ও মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন অনেক কনটেন্ট থাকে যা ভোগবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নৈতিক শিথিলতাকে উৎসাহিত করে। এর ফলে ইসলামি মূল্যবোধ যেমন সংযম, লজ্জাশীলতা ও নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শিক্ষার্থীদের আচরণ, চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ভোগবাদ, আত্মপ্রদর্শন এবং সময়ের অপচয় বৃদ্ধি পায়, যা ইসলামি মূল্যবোধ যেমন সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী।

কুরআন বলা হয়েছে:

> “নিশ্চয়ই শ্রবণ, দৃষ্টি ও হৃদয়—এসবের প্রতিটিরই হিসাব নেওয়া হবে।”
> — (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৩৬)

প্রযুক্তির ব্যবহার লাভজনক হওয়ার পাশাপাশি অন্যায় কাজেও এর ব্যবহার রয়েছে। সন্ত্রাসেরা বিভিন্ন অপকর্মে যেমন তথ্য আদান প্রদান, হ্যাকিংএর মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি ইত্যাদিতেও প্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকে।

৫.৫:শিক্ষা পাঠ্যক্রমে মূল্যবোধগত পরিবর্তন

আধুনিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে প্রযুক্তিগত দক্ষতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনেক ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে পড়ে।

Syed Muhammad Naquib al-Attas শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার অভাবকে “loss of adab” হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, শিক্ষা কেবল তথ্য প্রদান নয়, বরং মানুষের মধ্যে সঠিক আচরণ ও নৈতিকতা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া।

এই পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হলেও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

৫.৬:মুসলিম সমাজে এর প্রতিক্রিয়া ও অভিযোজন

পাশ্চাত্য প্রভাবের মুখে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ সম্পূর্ণভাবে আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করছে, আবার কেউ ঐতিহ্যগত শিক্ষা ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরছে। তবে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, যেখানে আধুনিক জ্ঞান ও ইসলামি মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব।

সারসংক্ষেপ,

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য প্রভাব একটি বাস্তবতা, যা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে এই প্রভাবকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে ইসলামি মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একদিকে আধুনিক জ্ঞান অর্জন করবে, অন্যদিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ হবে।

অধ্যায় ৬:অপসংস্কৃতি রোধে ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই

সংস্কৃতি মানব জীবনের এক অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। সংস্কৃতি শব্দটি গঠিত হয়েছে সংস্কার শব্দ থেকে। সংস্কার অর্থ হলো- শুদ্ধি, পরিস্করণ, পরিমার্জন, মেরামত, সংশোধণ ইত্যাদি। আর সংস্কৃতি অর্থ সংস্করণ, বিশুদ্ধিকরণ, সুশোভিত, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ ইত্যাদি। সংস্কৃতি শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Culture যার আভিধানিক অর্থ মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। Culture শব্দটি ল্যাটিন Culture থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ Cultivation বা চাষাবাদ। সংস্কৃতি শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে আরবীতে 'সাকাফাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় যার অর্থ পরিশীলিত, মার্জিত, সচেতন, ও তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ইত্যাদি।

সংস্কৃতি কী একথা শুনতেই আমরা সাধারণভাবে আমাদের চারপাশে চলমান নাট্য চর্চা, চিত্রকলা, প্রত্নতত্ত্ব, ললিতকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য ও কাব্যচর্চা বা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়কে সামনে নিয়ে আসি এবং মনে করি এগুলিই আমাদের সংস্কৃতি। কিন্তু বিষয়টি শুধু সেরকম নয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও পন্ডিত বিভিন্ন ভাবে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন করেছেন। উনিশ শতকে এডওয়ার্ড টেইলরের দেয়া সংস্কৃতির সংজ্ঞাকে বেশ উপযোগী বলে ধরা হয়। সেই সংজ্ঞা মতে- "মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং জ্ঞানের একটি সমন্বিত প্যাটার্নকে সংস্কৃতি বলা যায়।" ভাষা, সাহিত্য, ধারনা, ধর্ম ও বিশ্বাস, রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন, উৎসব, শিল্পকর্ম এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার হয় এমন জিনিসপত্র বা হাতিয়ার ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই সংস্কৃতি। এমনকি, সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব শিক্ষা, সামর্থ্য এবং অভ্যাস আয়ত্ত করে, তাও সংস্কৃতির অংশ।

সংস্কৃতি বিষয়ক উল্লেখিত ব্যাখ্যাগুলো পর্যালোচনা করলে একটি কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সংস্কৃতি হলো একজন মানুষের মধ্যে লুকানো মানবিক গুনাবলীর যথার্থ পরিস্ফুটন এবং মানবীয় ত্রুটি সংস্কারের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও সফল মানুষ হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করা। একটি জমিকে যেমন ভালো করে কর্ষণ দিয়ে, বীজ বপনের উপযুক্ত করতে হয় তারপর উত্তম বীজ বপন করে, নিয়মিত পরিচর্যা, আগাছা দমন এবং সময়ানুযায়ী সেচ-নিকাশের ব্যবস্থা করে, পোকার আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য

কার্যকরী কীটনাশক ব্যবহার করে উত্তম ফলন নিশ্চিত করতে হয় তেমনি মানুষকেও সর্বোত্তম, নিস্কলুস ও ত্রুটিমুক্ত জীবন ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নিজেকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে প্রমান করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো এই নিস্কলুস, সার্বজনীন, ত্রুটিমুক্ত ও সর্বোত্তম সংস্কৃতি কোথা হতে আসবে? হ্যাঁ, এটি আসবে মহান রাব্বুল আলামীনের দেয়া বিধান থেকে। কারন তিনিই মানবের একমাত্র স্রষ্টা এবং বিধানদাতা। তিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা ঘোষণা দিয়েই শুধু পাঠাননি; সাথে সাথে সৃষ্টির সেরা যোগ্যতা অর্জনের জন্য শাশ্বত জীবন দর্শন দিয়েছেন; যার নাম 'ইসলাম'। 'ইসলাম' নিছক কোন ধর্মের নাম নয়। এটি একটি পরিপূর্ণ, সফল, নিস্কলুস, নির্ভুল ও সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। আমরা মুসলমান হিসেবে ইসলামকে যেহেতু আমাদের একমাত্র 'জীবন ব্যবস্থা' হিসেব মেনে নিয়েছি সেহেতু সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইসলামি সংস্কৃতিকে আমাদের জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং চর্চা করতে হবে, এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ মুসলমান হিসেবে আমাদের নেই। ইসলামি সংস্কৃতি বলতে আমরা কী বুঝি? সাধারণ ও সরল কথায় শাশ্বত জীবন বিধান ইসলাম মানবজাতির জন্য যে সংস্কৃতির শিক্ষা দেয় তা-ই হলো ইসলামি সংস্কৃতি। যার আদি বা মূল উৎস হলো ঐশী গ্রন্থ আল কোরআন ও প্রিয়নবী'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ বা হাদিস। মিশরের প্রখ্যাত ইসলামি দার্শনিক অধ্যাপক হাছান আইয়ুব ইসলামি সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- "কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক মানুষের সামষ্টিক জীবনের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, আবেগ-অনুভূতি, অনুরাগ, মূল্যবোধ, কর্মকান্ড, আচরণ, সৎকর্মশীলতা, উন্নত নৈতিকতা তথা জীবনের পরিমার্জিত ও পরিশোধিত সকল কর্মকান্ড, মানুষের পরিপূর্ণ জীবনধারা ও পরিমন্ডলই ইসলামি সংস্কৃতির আওতাধীন"।

ইসলামি সংস্কৃতির মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ বিধায় তা বাস্তবতা ও মানবিকতার উৎকর্ষতায় উত্তীর্ণ ও পরিপক্ষ। বিশ্বে একমাত্র সার্বজনীন, বিশুদ্ধ, পরিমার্জিত, পরিশীলিত, রুচি ও মর্যাদাপূর্ণ এবং কল্যাণকর সংস্কৃতি হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। এতে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। নেই কোন অবাস্তব, অসুন্দর, অনৈতিক, অশোভন, অশালীন ও অমর্যাদাকর বিষয়। ইসলামি সংস্কৃতি একটি মানবতাবাদী সংস্কৃতি এবং সম্পূর্ণভাবে একটি মানসিক শিল্প। ইসলামি সংস্কৃতি মানুষকে ইহজাগতিক সফলতা, শান্তি, মর্যাদা এবং পরজাগতিক মুক্তির পথকে সুগম করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে প্রেরণ করেছেন

যাতে জন্ম থেকে মৃত্যু এবং তার পরবর্তী অবিনশ্বর জগত পর্যন্ত নির্দেশিকা রয়েছে। পবিত্র কুরআনুল করীমে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিলেন- "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম" (সূরা মায়েদা)।

একজন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার ডান কানে আযান দেয়া, একটি সুন্দর ও অর্থবোধক নাম রাখা, আকিকা করা, প্রথম পবিত্র বাক্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দেয়া, খতনা করানো, কুরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস করানো, নির্দিষ্ট বয়সে সালাতের তাগিদ দেয়া, উপযুক্ত ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এভাবে ধীরে ধীরে ইসলামি সংস্কৃতিগুলো শিক্ষা দিয়ে একজন পরিপূর্ণ মুসলমান তথা মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার যে অনুপম শিক্ষা ইসলামে রয়েছে তা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা দর্শনে নেই। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি দুনিয়াতে কীভাবে চলবে, কী খাবে কী খাবে না, উঠা-বসা, আচার-আচরন, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, আত্মিক, সামষ্টিক, শিল্পকলা, চিত্রকলা, সাহিত্য চর্চা, আনন্দ-বিনোদন সবকিছুই রয়েছে ইসলামি সংস্কৃতিতে। অন্যদিকে মানব মস্তিস্ক প্রসূত, ইসলামি রীতি-নীতি বিরুদ্ধ, অকল্যাণকর যা মানুষকে মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা না দিয়ে নগ্নতা ও বেহায়াপনা কিংবা ধর্মহীনতার শিক্ষা দেয় তা-ই অপসংস্কৃতি। এক কথায় ইসলামি সংস্কৃতির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয় এমন সব কর্মকাণ্ডই অপসংস্কৃতি ও বর্জনীয়। মানবজীবনের এমন কোন অধ্যায়, বিভাগ কিংবা দিক নেই যেটির ব্যাপারে ইসলাম শিক্ষা দেয়নি। অথচ আজ মুসলিম জাতি তার নিস্কলুষ ও কালজয়ী সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে আধুনিক সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতিকে জীবনের অনুষঙ্গ বানিয়ে দেদারছে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে যা সত্যিই দুঃখজনক, অপমানকর এবং ভয়ানক। আমরা যদি নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলিম হয়েও ইসলামি সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন। দেশের অধিকাংশ মুসলমান ইসলামকে একটি সাংস্কৃতিক বিধান হিসেবে জানে না এবং ইসলামের অনুপম সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পর্কে তাদের ধারণা খুবই অপ্রতুল। যার ফলে আধুনিক সংস্কৃতির নামে পরদেশী নগ্ন অপসংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতি মনে করে কাছে টেনে নিচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আদর্শহীন অন্ধকার পথে ঠেলে দিচ্ছে। একশ্রেণির স্বঘোষিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, পশ্চিমাদের দালাল, বিকৃত রুচির মানসিকতা সম্পন্ন লোক দেশে আধুনিক সংস্কৃতির নামে বিজাতীয়, অনৈসলামিক ও অপসংস্কৃতিকে

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা বিভিন্ন কৌশলে দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগিয়ে অপসংস্কৃতির প্রচার-প্রসার করছে যার কারনে আজকের সমাজে সাম্য, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, আদব কায়দা, শিষ্টাচার ইত্যাদি লোপ পাচ্ছে। বার্থ ডে, ম্যারেজ ডে, লাভ ডে, এপ্রিল ফুল, থার্টি ফাস্ট নাইট, হ্যালোইন ডে, বিজয় মেলা, পহেলা বৈশাখ সহ বিভিন্ন বিশেষ দিন ও অনুষ্ঠান সমূহে যেভাবে অপসংস্কৃতি তথা ভিনদেশী ও নগ্ন সংস্কৃতির ছড়াছড়ি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বেশ ক'বছর যাবত আবার শুরু হয়েছে ভিনদেশী সংস্কৃতির 'হোলি' উৎসব যা নিতান্তই ভিনধর্মী উৎসব অথচ মুসলমানের ছেলে-মেয়েরাও এই বেহায়াপনায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে আজ আমরা পাপাচার, অত্যাচার, ইভটিজিং, বর্বরতা, হঠকারিতা, ধর্ষন, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ, দূর্নীতি, মাদকাসক্তি আর উচ্ছৃঙ্খলতায় জর্জরিত। মুসলিমপ্রধান এই মাতৃভূমির গৌরবময় জনপদের হাজার বছরের নিস্কলুষ মুসলিম সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করার এক হীন চক্রান্ত ও নীল নকশা প্রণয়ন করেছে খৃস্টান, ইহুদী ও ধর্মনিরেপেক্ষতার ধ্বজাধারী ভারতীয় আর্য ভ্রাহ্মনবাদী এবং এদেশীয় কিছু জ্ঞানপাপী, মুক্তমনা নামধারী দালাল। তারা মুসলমানদের ঈমান-আকিদা, মানবিক মূল্যবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও কল্যাণকামী সর্বজনীন সমাজ ব্যবস্থা তথা সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও কার্যকর যে কাজটি করেছে তা হলো তাদের নিয়ন্ত্রিত টিভি চ্যানেল ও সামাজিক মাধ্যমগুলোর দ্বারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আমরা যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশের জন্য যথেষ্ট ফাঁদ তারা পেতেছে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, শিল্প, সাহিত্য, এনজিও, চিকিৎসাকেন্দ্র, বিউটি পার্লার, সমিতি, সুন্দরী প্রতিযোগীতা, ফ্যাশন শো সহ বিভিন্ন উপায়ে তারা আমাদের মাঝে অপসংস্কৃতির বীজ বপন করছে আর ছড়িয়ে দিচ্ছে নগ্নতা ও বেহায়াপনা। কিন্তু তারা জানে না তাদের জন্য কত কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছে মহান আল্লাহ। কুরআনের সূরা নূরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- "যে সব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের সমাজে নিলর্জ্জতা বিস্তার লাভ করুক তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না"। অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "তিন প্রকার লোক আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত-১.) হারাম শরীফের পবিত্রতা বিনষ্টকারী ২. ইসলামে বিজাতীয় রীতি-নীতির(সংস্কৃতির) প্রচলনকারী, ৩. কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যার প্রচেষ্টাকারী (বুখারী)।

সময় এসেছে নতুন করে ভাববার এবং এসব অপসংস্কৃতি থেকে আগামী প্রজন্মকে বাঁচাবার। আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে, যে কর্ম ব্যক্তি বা সমাজের সামগ্রিক, শান্তিপূর্ণ ও পবিত্র পরিবেশকে ব্যাহত করে তা নৈতিকতা বিরোধী এবং ইসলামি সংস্কৃতির পরিপন্থী। ইসলামি সংস্কৃতির সার্থক রূপায়ক হলেন মানবতার শ্রেষ্ঠ সংস্কারক, আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যার পুরো জীবন হলো আল-কুরআনের বাস্তব রূপ। তাই জীর্ণ কুঠিরে, ছিন্ন বস্ত্রে অর্ধভূক্ত অনাড়ম্বর মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আইয়ামে জাহেলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্ন আরব উপদ্বীপকে বিশ্ব শান্তির মডেলে পরিণত করেছিলেন যা পৃথিবীর প্রলয়দিন পর্যন্ত অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। ইসলামি সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য 'সত্যবাদীতা'র এক অদ্বিতীয় নজির স্থাপন করেছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর শৈশবেই। কাফের-মুশরিকরা পর্যন্ত তাঁকে আল-আমীন নামে সম্বোধন করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষনা করেন- ''নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী''(সূরা ক্বলম)। তাই আমাদেরকে ইসলামি সংস্কৃতির সূতিকাগার পবিত্র কুরআন ও প্রিয় নবীর জীবনাদর্শ অনুসরনের মাধ্যমে প্রচলিত অপসংস্কৃতিকে নির্মূল করে সমাজে ইসলামি সংস্কৃতির স্রোতকে আরো গতিময় করার পদক্ষেপ নিতে হবে। ইসলামে এটা নেই, ওটা নেই বলে গলা ফাটালে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ হবেনা বরং ইসলামি সীমারেখার মধ্যে থেকে জীবনের জন্য উপাদেয়, আনন্দদায়ক, সর্বজনীন ও নিস্কলুষ সংস্কৃতি চর্চার বাস্তব দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করতে হবে সাধারণের কাছে এবং প্রচলিত অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রত্যেকটি অনুষঙ্গ চিহ্নিত করে তার বিকল্প হিসেবে ইসলামি সংস্কৃতির রূপরেখা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে অন্যথায় অপসংস্কৃতির ভয়াল স্রোতকে দমানো সম্ভব হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বাংলা নববর্ষ ও খৃস্টিয় নববর্ষের অপসংস্কৃতি থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে হিজরী নববর্ষ উদযাপন করতে হবে এবং তুলে ধরতে হবে হিজরি নববর্ষের ইতিহাস, পালনীয় ও বর্জনীয় ইসলামি ঐতিহ্য।লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল নিছফ মিন শাবান (লাইলাতুল বরাত), শবে মেরাজ, আশুরা, সালাম, সাওম, যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি ইসলামি সংস্কৃতি চর্চা মানুষকে দ্বীনের পথে উজ্জীবিত করে।

আমাদের তথাকথিত আধুনিক, ধর্মহীন, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বিজাতীয় অপসংস্কৃতিকে "না" বলে এবং ইসলামের শাশ্বত, কল্যাণকর ও সার্বজনীন সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করে সত্য ও সুন্দরর ছোঁয়ায় নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে একটি আদর্শিক, শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করতে হবে- “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের রক্ষা করুন”-(সূরা বাকারা)

অধ্যায় ৭:মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে শিক্ষা ব্যর্থ কেন?

শিক্ষার হার দিন দিন বাড়ছে কিন্তু সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অপরাধও! নতুন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে কোমলমতি শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিরা এর থেকে মুক্ত থাকতে পারছেন না। তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কি শিক্ষিত চতুর দুর্নীতিবাজ মানুষ তৈরি করছে? দেশ দুর্নীতিতে বারবার চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক-মজুর মেহনতি মানুষের কারণে নয়! দুর্নীতির শীর্ষস্থানে রয়েছে আমাদের দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কারণে! তাহলে আমাদের শিক্ষা কি ব্যর্থ? শিক্ষাব্যবস্থা কি নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন জাতি তৈরি করতে পারছে না? তাহলে শিক্ষার দুর্নীতির হারকে কেন বাড়িয়ে দিচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থার এ গলদ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

মূলত শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম। অন্যসব মৌলিক অধিকার পূরণের বিকল্প মাধ্যম ও পদ্ধতি থাকলেও শিক্ষার বিকল্প শিক্ষাই। কোন মানুষ যদি খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে বড়জোর এই মানুষটি ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাবে পুষ্টিহীনতায় দুর্বল হয়ে পড়বে। আহার পেলেই এটি নিবারণ হয়ে যাবে। কিন্তু কোন মানুষ যদি শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অথবা প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে তাহলে সে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাকে আমরা বলি অশিক্ষিত। কারণ শিক্ষার সাথে ব্যক্তির মৌলিক সত্তা জড়িত। সুতরাং এই দুই বঞ্চিতের মধ্যে ব্যবধান আকাশ-পাতালের চেয়েও বেশি। শিক্ষা কেবলমাত্র মানুষের জন্যই প্রয়োজন। অন্য কোন প্রাণীর শিক্ষার দরকার নেই। অন্য প্রাণীর নেই কোন স্বাধীনতা। মৃত্যুর পর নেই জবাবদিহিতা।

এই জন্য অজ্ঞতার 'অ'-এর ব্যবহার অন্য কোন প্রাণীর সাথে কোনোভাবেই সুশ্রী হয় না। যেমন গরু ও ছাগল কোন নিয়ম ভঙ্গ করলে আমরা তাদেরকে অ-গরু অথবা অ-ছাগল বলে আখ্যায়িত করি না। কিন্তু কোন মানুষ অন্যায় করলেই আমরা তাকে অমানুষ, অভদ্র, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি নামে সম্বোধন করে থাকি। কারণ শিক্ষা মানুষের জীবনের সাথে জড়িত অধিকার। জীবনকে যেমনি তুচ্ছ করা যায় না, শিক্ষাও তার ব্যতিক্রম নয়। আর শিক্ষার এই বিস্তৃত রূপকে সামনে রেখেই বলা হয় 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।' মেরুদন্ড ছাড়া যেমনি কোন প্রাণী দাঁড়াতে পারে না, তেমনি প্রকৃত শিক্ষা ছাড়াও জাতি অচল। কিন্তু কেন আজও জাতি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলাম না এ প্রশ্নটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের। যে জাতি স্বাধীনতার ৪২ বছরেও

ঐকমত্যের ভিত্তিতে তার পরিচয় নিয়ে দ্বিধান্বিত, এখনো নেই সম্মিলিত কোন শিক্ষানীতি সেই জাতির মুক্তির পথ অনেক অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আবর্তিত কি না তা আজ আমাদেরকে আবার ভেবে দেখতে হবে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। দেশের মানুষের প্রত্যাশা ছিল এমন একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হবে যা ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা, বিশ্বাস এবং দলীয় দৃষ্টিভক্তির ঊর্ধ্বে ওঠে এ দেশের মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, কৃষ্টি-সভ্যতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং যুগচাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তৈরি। যেহেতু শিক্ষানীতি একটি দেশের সুনাগরিক তৈরির দিকনির্দেশনা বিধায় এটা জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বিশ্বায়ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মতো নেতৃত্বদানকারী, যোগ্য কর্মমুখী, সুদক্ষ, সৎ, আদর্শবান ও প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলাই হবে এর মূল উদ্দেশ্য। আর জাতিকে কাঙ্খিতমানে উন্নীত করার জন্য শিক্ষানীতিতে সর্বাধিক গুরত্ব পাবে (ক) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (খ) কারিগরি শিক্ষা (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা। ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠন করা হয় বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন। জাতির অধঃপতন মূলত ঐ দিন থেকেই এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ কলোনিয়াল চেতনাকে সংরক্ষণ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তাঁবেদার নাগরিক তৈরি করাই ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের মূল লক্ষ্য ছিল। জাতি হিসেবে আমরা কাগজে কলমে ব্রিটিশ বেনিয়ার কবল থেকে মুক্তি পেলেও তাদের চিন্তার কবল থেকে রেহাই পাইনি। এটি আবার প্রমাণিত হয়েছে। ব্রিটিশদের আনন্দের বর্ণনা তাই আজো এভাবে- 'ÔWe must at present do our best from a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indians in blood and colour, but in English in tastes, in options in morals and intellect.' অর্থাৎ, যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা শাসন করছিল তাদের সাথে শাসক ইংরেজদের মধ্যে দূতের কাজ করা এবং রক্তে ও গায়ের রঙে ভারতীয় হলেও মেজাজে, চিন্তাভাবনায়, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ হয়ে যাবে-এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। যারা ধ্যানে চিন্তা-চেতনায় নাস্তিকতাকেই লালন করে থাকেন তাদের পক্ষে কি সার্বজনীন কোন নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব? আর তাইতো ব্রিটিশদের কেনা গোলামরা এমন এক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করল যা এদেশের মানুষের ঈমান-আকিদা, তাহজিব-তমদ্দুনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আজকে এ দেশের নাগরিক হয়ে ভিন দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কেউ কেউ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান। দেশের কৃষ্টি-কালচার, তাহজিব-তমদ্দুন এমনকি ৯০ ভাগ মানুষের সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা দ্বিধা করেন না। এটিই ব্রিটিশদের পরিচালিত শিক্ষারই ফল।

এ শিক্ষানীতির এমন অনেক বিষয় যা অসঙ্গতিপূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী। তা ছাড়া এ শিক্ষানীতি গতানুগতিক ও নৈতিক দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। ধর্মের দিকটা এখানে উপেক্ষিত কেন? আজ এই প্রশ্নটি খুব বড় করে দেখা দিয়েছে। এই শিক্ষা নীতি কি আদৌ আমাদের প্রয়োজনে করা হয়েছে?

'জাতীয় শিক্ষানীতি' হতে হয় 'জাতীয় চেতনাভিত্তিক। কিন্তু আজ পর্যন্ত বর্তমান সরকারও সরকারি দল এ দেশের 'রাষ্ট্রীয় জাতীয় পরিচয়' (Nationhood) নির্ণয় করতে পারেনি। শিক্ষানীতি বা এডুকেশন পলিসি' (Education Policy) দলভেদে জাতিভেদে, ধর্মভেদে, রাষ্ট্রভেদে ও সরকারি নীতি এবং দৃষ্টিভক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষানীতি এবং ওই সময়ের যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের 'শিক্ষানীতি' এক ছিল না। বর্তমান কিউবা ও কানাডার শিক্ষানীতিও এক নয়। এক নয়, পাশাপাশি অবস্থিত সমাজতান্ত্রিক চীন এবং গণতান্ত্রিক ভারতের শিক্ষানীতিও। একই গণতান্ত্রিক ও পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি দেশ; ভারত এবং পাকিস্তানের শিক্ষানীতিও এক নয়। কারণ ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ আর পাকিস্তান মুসলিমপ্রধান দেশ। তাই তাদের শিক্ষানীতিও আলাদা। বাংলাদেশও একটি 'মুসলিমপ্রধান দেশ হওয়ায় তারও শিক্ষানীতি ভারত বা চীনের মতো হতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় জাতির (Nation) নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই 'শিক্ষানীতি' প্রণীত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় জাতির বৈশিষ্ট্য কী; আসলে আমাদের জাতীয় (National) কোনো চরিত্র নেই।তাই 'শিক্ষানীতি'র কোনো 'দার্শনিক ভিত্তি' নেই।

এই শিক্ষানীতিতে পবিত্র সংবিধান, জাতিসত্তা, জাতীয় বিশ্বাস-মূল্যবোধ-ঐতিহ্য-চেতনার পুরোপুরি প্রতিফলন হয়নি। যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িকতা, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, সমমৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা, উপজাতিদের আদিবাসী বলা, প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চতর স্তরে কাঠামো ভেঙে দিয়ে হ-য-ব-র-ল করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সকল ধারায় এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম-পাঠ্যক্রম-পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র পরীক্ষা-মূল্যায়ন-ব্যবস্থা, শিক্ষকদের বদলি নীতি, ক্যাডেট ও বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, অন্যান্য ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যনীতি,

ইংলিশ মিডিয়াম ও এনজিও শিক্ষার্থীদের অনিয়নিন্ত্রত রাখা, মাদরাসা শিক্ষার মৌলিক বিষয় কমিয়ে এনে স্কুলে পরিণত করার কৌশল গ্রহণ, কওমি মাদরাসার প্রতি ঔদাসীন্য, উচ্চাশিক্ষার ব্যাপক বৈষম্য ও সংকোচন নীতি এবং ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত না রাখা, প্রকৌশল চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার সংকোচন, নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা, প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষার নামে সংবেদনশীল বিষয় চালুকরণ, কারুকলার নামে নৃত্য-অঙ্গবিক্ষেপ যাত্রা সিনেমা ব্রতচারী শিক্ষা চালুকরণ, প্রতিরক্ষা ও সামরিক শিক্ষার ব্যাপারে কোন বক্তব্য না দেয়া এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও জনগোষ্ঠীর শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন্য, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে কোন কিছু না বলা, শিক্ষকদের সর্বোচ্চ স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রদানের ব্যাপারে কোন কিছু না বলা এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে কিছু বিষয়ের বিলুপ্তি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ স্তরবিন্যাসের ফলে শিক্ষকদের চাকরি হারানোর আশঙ্কাসহ আরো অনেক ব্যাপারে এ শিক্ষানীতিতে অপূর্ণাঙ্গতার ছাপ রয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি ধর্মবিমুখ রাজনৈতিক দর্শন। দেশের মানুষ রাতে আজানের আওয়াজ শুনে ঘুমাতে যায় আর মুয়াজ্জিনের ফজরের আজানের ধ্বনিতে ঘুম ভাঙে সেই জাতিকে এত সহজেই কি ধর্মবিমুখ বানানো সম্ভব? ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উৎপত্তির সংঘাত তো ইসলাম অথবা মুসলমান কারো সাথেই নয়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সবচেয়ে বড় আঘাতের লক্ষ্য ইসলাম ও মুসলমানরা।
'র‍্যানডম হাউজ অব দ্য ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ'-এ Secular বা ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "যা ধর্ম সম্পর্কিত নয় (Not pertaining toor connceted with religious order)। আর ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটি একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith)| Encyclopedia of Britanica–র সংজ্ঞাও অনুরূপ। অর্থাৎ যারা কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, কোনো ধর্মের অনুসারী নন, কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ। চেম্বারস ডিকশনারির মতে, Education should be independent of religion" অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মমুক্ত থাকবে।

চার্চ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে ইউরোপে প্রথম Secular রাষ্ট্র দর্শনের প্রসার ঘটে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিভিন্ন দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। এর বিকাশে সহায়তা করছে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, শিল্প বিপ্লব, জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব, ফরাসি বিপ্লব এবং বিভিন্ন দার্শনিকের (যেমন- ম্যাকিয়াভেলি, থমাস, হবস, জর্জ জের, মার্ক্স এঙ্গেলস, ভলটেয়ার প্রমুখ) নাস্তিক্য, বস্তুবাদী, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি চিন্তাধারা।

Oxford Dictionary-‡Z Secularism means the doctrine that morality should by besed sotely of regard to the wellbeing of mankind in the present life be exclusion of all consideration draw from belief in good or in future state.

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এমন এক মতবাদ যা মনে করে আল্লাহ বিশ্বাস, পরকাল বিশ্বাস বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

প্রাচ্যবিদ ড. স্মিথের মতে "ÒThe secular state is a state which guarantees of religion, deals with individuals as citizen irrest active of his religion is not constitutionally corrected to a particular religion nor does it seek either to promote or intyer fere with religion"

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় এমন এক রাষ্ট্র যা ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে ব্যক্তিকে ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রে কোনো ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে না- ধর্মের উন্নতিও চায় না, হস্তক্ষেপও করে না। বস্তুত Secularism বলতে বোঝায় এমন মতবাদ, যা পারলৌকিক ধ্যান-ধারণা ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। রাষ্ট্রের নীতি ও পরিচালনায় কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করে না মুসলিমবিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা। ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা।

মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের আধুনিক যুগে উত্তরণকাল সেকুলার শব্দের অর্থ একটু একটু করে সম্প্রসারিত হতে থাকে। সাহিত্য, শিল্প ইতিহাস, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হলে সেক্যুলার অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় ধর্মের সেবায় নিযুক্ত নয় ও ধর্ম বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নয়- এমন। ঠিক যেমন সেকুলার শিক্ষা মানে ধর্ম শিক্ষা নয়- এমন শিক্ষা।

সেকুলারিজম আদর্শ ইসলামের তৌহিদের কিংবা অন্যান্য ধর্মের মৌল চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ প্রেক্ষিতেই সেকুলারিজমে মানুষের জ্ঞানকেও ধর্মীয় অনুশাসনমুক্ত করার কথা বলা হয়। শেষ পর্যন্ত সেকুলারিজমের লক্ষ্য হলো ধর্ম বা প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান থেকে বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তি এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা। এখানে একজন পাশ্চাত্যের পন্ডিতের দেয়া সেকুলারিজমের সংজ্ঞার উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

The deliverance of man first from religious and then from metaphysical control over his reason and his language.. The loosing of itself, the dispelling of all closed world views, the breaking of all troy, the discovery by man that he has been lift with the world on what be does with it..., (It is) man turning his at attention away from worlds beyond and toward this world and this time (The secular City Harvey Cox)

সেকুলারিজম মানে ধর্মনিরপেক্ষতা নয় একটি ধর্মহীনতা। কেউ কেউ এতদূর না গেলেও এটি মানে যে সেকুলারিজমে নাস্তিক্যের বীজ লুকিয়ে আছে। আর এটাতো সত্য রেনেসাঁর ভেতর দিয়ে ইউরোপীয় মানবতন্ত্রী দর্শনের বিকাশ ঘটেছে তা কিন্তু সেকুলারিজমের পথ ধরে কে একে নাস্তিক্যের কেন্দ্র এসে ঠেকেছে, যা আসলে ঈশ্বর ও ধর্মচিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইউরোপে সেকুলারিজম বিকশিত হয়েছিল তা মুসলিম দুনিয়ায় অনুপ্রবিষ্ট সেকুলারিজমের চেহারা থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। আগেই বলেছি সেখানকার সেকুলারিজমের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আছে এবং বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে সেই সেকুলারিজমের উদ্ভব হয়েছিল। ইউরোপের নিপীড়ক চার্চকে রাষ্ট্র থেকে মুক্ত করার জন্য সেদিন সেকুলারিজমের দরকার ছিল। অন্যদিকে মুসলিম দুনিয়ায় এ চিন্তা-চেতনা ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্যের আগ্রাসনবাদী সংস্কৃতি কর্তৃক এক আরোপিত ধারণা। মুসলিম দুনিয়ার ক্ষেত্রে তা তেমন কোন কাজে লাগেনি বা লাগসই উন্নয়নের মডেল হিসেবেও ব্যবহার করা যায়নি, এমনকি এখানকার সাধারণ মানুষের জীবনেও সেকুলারিজম প্রাসঙ্গিক ধারণা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই মুসলিম দুনিয়ায় সেকুলারিজম পাশ্চাত্য প্রভাবিত মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীও এলিট শ্রেণীর সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার বাহন হিসেবে কাজ করেছে। ইউরোপ খ্রিষ্ট ধর্মের চার্চের তুল্য কোন প্রতিষ্ঠান ইসলামের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। মুসলিম দুনিয়ায় চার্চের তুল্য কোন প্রতিষ্ঠানও নিপীড়কের ভূমিকায়

কখনোই অবতীর্ণ হয়নি। চার্চ কর্তৃপক্ষ যেমন করে সেদিনকার ইউরোপে সব রকমের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও ক্রিয়াকান্ডকে নিষিদ্ধ করেছিল এর তুলনীয় ঘটনাও ইসলামে নেই। উল্টো ইসলামে ধর্মীয় নেতৃত্ব যারা দিয়েছেন সেই আলেম-উলামা, মুফতি মুদাররেসরা মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সময় অত্যাচারী রাজা-বাদশাহদের বিরুদ্ধে খুতবা দিয়েছেন এরকম নজির ইসলামের ইতিহাসের ভূরি ভূরি। বাংলাদেশেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ১০০% লালন আলেম-উলামারাই করে থাকেন। এটাই ইসলামের শিক্ষা। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আলেমরা তো মুসলিমবিজ্ঞানীদের সাথে হাতে হাত ধরে কাজ করেছেন। সুতরাং ইউরোপে সেকুলারিজম বিকাশের প্রেক্ষাপট দিয়ে মুসলিম দুনিয়া সেকুলারিজমের আগমন ও প্রয়োজনকে বিশ্লেষণ করা অনর্থক। এই বড়ি বাংলাদেশের মানুষ গিলবে না। কারণ এ জমিনের সাথে ইসলামের নাড়ির সম্পর্ক। এটি উপড়ানোর চেষ্টা করলে অনেকে নিজেই উপড়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।
পাশ্চাত্যের সেকুলারিজম ছিল এক ধরনের ধর্মের বিকল্প এবং ধার্মিক হওয়ার হয়তো বিকল্প রাস্তা। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের সেকুলারিজম সাধারণ মানুষে ধর্ম ও ধামির্কতার ওপর কঠোর আক্রমণ চালিয়েছে মাত্র। সঙ্গত কারণে সাধারণ মানুষ তাই সেকুলারিজমকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে মনে করছে। বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
দ্য ওয়ার্ল্ড বুক অব এনসাইক্লোপেডিয়াতে বলা হয়েছে, This approach became Known as secularism because it is separated politics from religion.. অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্ম থেকে আলাদা একটি রাজনীতির নাম। পরিভাষাটি অর্থেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন অব ইথিকস সেকুলারিজম এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে যে,Secularism may be described as a movement intentionally ethical negatively religious with political and philosophical antecedent. অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ রাজনীতি ও অবরোহী দর্শনের ভিত্তিতে ধর্মের বিপরীত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এক আন্দোলনের নাম।

মোটকথা,বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে বিজাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর লালিতপালিত হচ্ছে। যা আমাদেরকে মূল্যবোধ সম্পূর্ণ ব্যক্তি বা জাতিতে পরিণত হওয়াকে বাধা গ্রস্থ করছে।

অধ্যায় ৮: পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা মূলত জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ হয়ে উঠলেও অনেক ক্ষেত্রে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা কেবল তথ্য বা পেশাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম নয়; বরং এটি মানুষের সার্বিক বিকাশের একটি প্রক্রিয়া। ইসলামে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের চরিত্র গঠন, নৈতিক উন্নয়ন এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা। কুরআন ও হাদিসে জ্ঞান অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তবে সেই জ্ঞান যেন মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয় এবং নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে—এটিই মূল লক্ষ্য।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার উপস্থিতি থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত ও আনুষ্ঠানিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় শিক্ষা পরীক্ষামুখী হয়ে পড়েছে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি শুধু নম্বর অর্জনের জন্য পড়ে, কিন্তু বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন ঘটে না। এর ফলে সততা, দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মতো মৌলিক মূল্যবোধ দুর্বল হয়ে পড়ে।

পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার যথাযথ অন্তর্ভুক্তি নৈতিক অবক্ষয় রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে সৎ, দায়িত্বশীল ও ন্যায়পরায়ণ হতে উদ্বুদ্ধ করে। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন—সহমর্মিতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয় পর্যায়েই ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়।

তবে আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়; বরং এদের মধ্যে সমন্বয় জরুরি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক জ্ঞানের সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটানো গেলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন পেশাগতভাবে দক্ষ হবে, তেমনি নৈতিকভাবেও দৃঢ় হবে।

পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষাকে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে এর উপস্থাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক শিক্ষার পরিবর্তে ব্যবহারিক ও জীবনমুখী

শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং বাস্তব জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধকে শিক্ষার্থীদের মাঝে গড়ে তুলতে হবে। তবে এই ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। অনেকেই মনে করেন ধর্মীয় শিক্ষা আধুনিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, আবার অন্যদিকে অতিরিক্ত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিও শিক্ষার গতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই প্রয়োজন একটি ভারসাম্যপূর্ণ, যুগোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি, যা ধর্মীয় শিক্ষাকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে অর্থবহ করে তুলবে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার যথাযথ স্থান নিশ্চিত করা একটি সুস্থ, নৈতিক ও মানবিক সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

অধ্যায় ৯:ইসলামি মূল্যবোধের শিক্ষা কেন প্রয়োজন?

বর্তমান জেনারেল শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে সেকুলারিজম ভিত্তিক। ব্রিটিশ প্রদত্ত নিয়মেই চলছে এদেশের শিক্ষানীতি। কুরআন হাদীস শিক্ষা বাদ দিয়ে ইসলাম শিক্ষার বিপরীত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পূর্নাঙ্গ ইসলামকে শিক্ষার্থীদের কাছে পেশ না করার অপচেষ্ঠা চলছে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতাহীন জীবনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

বিগত কয়েক যুগ ধরে কুরআন হাদীস শিক্ষাকে সংকুচিত ও খন্ডিত করে শিক্ষার্থীদের কাছে পেশ করা হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেনীতে ইসলাম ধর্ম শিক্ষাকে ঐচ্চিক রাখা হয়েছে। ফলে আদর্শ,সৎ, চরিত্রবান নাগরিক বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে না। কবি ইকবাল বলেছেন, "ধার করা শিক্ষায় আদর্শ মানুষ তৈরি হতে পারে না।" আদর্শ ও নৈতিক চরিত্রবান মানুষ তৈরি করতে হলে অবশ্যই ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যে ধর্ম মানুষকে ন্যায়নীতি আদর্শের শিক্ষা দিয়েছে। অন্যকোন ধর্ম মানুষকে এতগুলো ন্যায়-নীতি আদর্শের শিক্ষা দেয়নি। ইসলাম শিক্ষার অভাবে মুসলিম জাতি আজ সমগ্রবিশ্বে প্রতি পদে পদে বিপর্যস্ত ও পদদলিত। ন্যায়নীতি শিক্ষার অভাবে আজ অফিসের বড় কর্তা থেকে শুরু করে বয়-বেয়ারা পর্যন্ত সর্বস্তরের কর্মচারি দূর্নীতিগ্রস্থ। ঘুষ,দূর্নীতি,ধর্ষন,কালোবাজারি,টাকা পাচারের সাথে জড়িত অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষন, প্রতিবন্ধি শিশুকে ধর্ষন,খুনের মত নৃসংশ ও মর্মান্তিক খবর প্রতিনিয়ত গনমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছ।

মূল্যবোধের অভাবে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা নিম্নরূপ :

ঘটনা ১:

২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে তোফাজ্জল হোসেন নামক এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে চোর সন্দেহে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় হলের শিক্ষার্থীরা তাকে মারধরের মাঝে ক্যান্টিনে বসিয়ে ভাত খাওয়ায় এবং পরে পুনরায় পিটিয়ে গুরুতর জখম করে, যার ফলে তার মৃত্যু হয়।ঘটনার প্রধান বিষয়সমূহ:

- ভয়াবহ বর্বরতা: তোফাজ্জলকে প্রথমে আটক করে দফায় দফায় মারধর করা হয়, তারপর ভাত খাওয়ানো হয় এবং সবশেষে আবারও মারধর করা হয়।
- মানসিক অবস্থা: নিহত তোফাজ্জল মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে হলে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।
- শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্টতা: এই হত্যাকাণ্ডে ফজলুল হক হলের ৮ জন শিক্ষার্থীর সরাসরি সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি।
- মামলা ও আইনি পদক্ষেপ: ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে থানায় মামলা করা হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দায়ীদের শনাক্ত করা হয়েছে।

[বি.দ্র: হত্যাকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আজকের সন্তান,আজকের শিক্ষিত ছাত্রজনতা, যারা আগামীর ভবিষ্যৎ;তারা একজন ক্ষুধার্ত মানসিক রোগীকে ভাত খাওয়ানোর পরে পিটিয়ে হত্যা করল। তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল বটে,কিন্তু তাদের মধ্যে মূল্যবোধের অনেক অভাব। কারণ,আধুনিক শিক্ষা বস্তুবাদী দুনিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কাগজের সার্টিফিকেট ও কিছু দক্ষতা দিতে পারে,মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ।]

ঘটনা ২:6 অক্টোবর, 2019 তারিখে, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদকে বুয়েটের শের-ই-বাংলা হলের ভেতরে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীরা খুন করে।তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করার হয়। জানা যায়, হত্যাকারীরা দফায় দফায় তার ওপর অত্যাচার চালায় এবং অত্যাচারের মাঝে তার বিশ্রাম নেন, খাওয়া দাওয়া করে। একটা মানুষের মানসিকতা কতটা ধ্বংস হলে সে এতোটা পশুসুলভ আচরণ করতে পারে! এখানেও আধুনিক শিক্ষার অপারগতা প্রকাশ পায়। আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত করতে সক্ষম হলেও,সুশিক্ষিত ও উত্তম চরিত্রের মানুষ বানাতে ব্যর্থ।

ঘটনা ৩: টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে মাটি খুঁড়ে বস্তাবন্দি মা ও নবজাতকের মরদেহ উদ্ধারের ছয় দিনেও পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। ধারণা করা হয়, হতভাগ্য ওই নারীকে ধর্ষণ করে হত্যার সময় তাঁর সন্তান প্রসব হয়ে যায়।পরে উভয়কেই মাটিচাপা দিয়ে পালিয়ে যায় ঘাতক।সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তারা ওই এলাকায় দুর্গন্ধ পায়। পরে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে নারীর চুল দেখতে পায়। মাটির নিচে বাস্তার এক অংশ

কুকুর কামড়াচ্ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি খুঁড়ে ওই নারী ও নবজাতকের লাশ উদ্ধার করে।

এসব ঘঠনা বিশ্লেষন করলে বোঝা যায়, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। আর নৈতিকতা মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে। ইসলামের মূলনীতি শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা মৃত্যুযন্ত্রনা, হাশরের ময়দানে পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের হিসাব দান,পাপ পূন্যের বিচার,জান্নাতের শান্তি ও জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অধ্যায়ন করে খোদাভীরু ও উন্নত চরিত্রের অধিকারি সৎ-নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহন করার পর নৈতিকতা ও মানবিকতা থেকে শিক্ষার্থীদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। এজন্য পবিত্র কোরআনে সর্বপ্রথম কুরআন হাদীসের ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ করা হয়েছে। কুরআন হাদীস ও ইসলামি জ্ঞান অর্জন ছাড়া কোন জ্ঞানই পরিপূর্নতা লাভ করেনা। কুরআন ও হাদীস জেনারেল শিক্ষায় পরিপূর্নভাবে অর্ন্তভুক্ত না করার কারনে অধিকাংশ ছাত্ররা বিপদগামী হচ্ছে। ইসলামি জ্ঞান ও নৈতিকতার অভাবে কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মধ্যে নীতি আদর্শের অভাব দিন দিন পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার কারনে জেনারেল শিক্ষিত ছাত্ররা যখন তখন বিভিন্ন খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা পড়ালেখা বাদ দিয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। তারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে নারীদের যৌন হয়রানি করছে।

তারা রাজনীতিতে জড়িয়ে বিভিন্ন খারাপ কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করছে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল কলেজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ভাঙ্গচুর, হল দখল,সিট বানিজ্য,মাদকদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের মত অনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন সময় ছাত্ররা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বহু শিক্ষককে মারধর ও লাঞ্ছিত করার নজির সৃষ্টি করেছে। অথচ কখনো শুনিনি কোন মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র মাদ্রাসার দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি, মাদকদ্রব্য গ্রহন কিংবা মাদ্রাসার শিক্ষক ধরে পেঠাতে। মাদ্রাসা শিক্ষায় সর্বপ্রথম কুরআন হাদীস শেখানো হয় বিধায় তারা নৈতিক শিক্ষা অর্জন করে। ইসলামি নৈতিক শিক্ষা অর্জন করার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী জীবনে মা-বাবা, আত্নীয়-স্বজন, শিক্ষক ও প্রতিবেশির সাথে কিভাবে আচরন করতে হবে, তাদের

কিভাবে সম্মান করতে হবে এবং কিভাবে তাদের হক আদায় করবে তার যথাযত শিক্ষা ও নির্দেশনা লাভ করে। মানুষের চরিত্র গঠনে শ্রেষ্ঠ কারখানা হচ্ছে মাদ্রাসা।

মাদ্রাসা শিক্ষা হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়মুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। সৎ চরিত্রবান এবং নৈতিক আদর্শ ভিত্তিক নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা প্রয়োজন। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় সফলতা অর্জন করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে এখন আগের মত ভিক্ষা করে দেওয়া শিক্ষা বলা যাবেনা। কারন বর্তমানে মাদ্রাসায় পড়ে অনেক ছাত্র ঢাকা ইউনিভার্সিটি ও বুয়েটে চ্যান্স পাচ্ছে।

আগেরকার যুগে মাদ্রাসায় পড়ে বড় বড় মুসলিম মনীষীরা বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও গনিত শাস্ত্রে অবদান রেখেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রায় অবদান আল কুরআন রিসার্চ করে অর্জন করেছে। নানান রকম চিকিৎসা পদ্ধতির আবিস্কারের পেছনে মুসলমানদের অবদান রয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

একজন ডাক্তার ও একজন আইনজীবী মধ্য ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারনে সে তার পেশাকে সেবামূলক পেশা হিসেবে নিচ্ছে না। এতএব ধর্মীয় শিক্ষা বাদ দিয়ে আধুনিক শিক্ষা অর্জন করে লাভটা কি হল? অথবা ধর্মীয় শিক্ষা স্কুল কলেজ থেকে সংকুচিত ও খন্ডিত করে ব্রিটিশদের চালু করা আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন কি?

সন্তানের জন্য যে শিক্ষাটা আগে দরকার সেটা হল নৈতিক শিক্ষা। এই নৈতিক শিক্ষাটা জানার জন্য কুরআন হাদিস পড়তে হবে। এজন্য আমাদের বর্তমান জেনারেল শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা, গনিত,ইংরেজি,বিজ্ঞান শিক্ষার পাশপাশি কুরআন- হাদিস শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কুরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একজন সত্যিকারের নৈতিক চরিত্রবান ও বিবেকবান মানুষ তৈরি করতে হবে। সন্তানের জন্য বেশি সম্পদ জমা না করে, সন্তানকেই সম্পদ বানিয়ে যান। সন্তানকে ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার বানানোর আগে মানুষ বানান। শুধুমাত্র শিক্ষিত নয়, সুশিক্ষিত করার জন্য জেনারেল

শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। ইসলাম শিক্ষা মানুষকে একজন যথার্থ নৈতিক গুনসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

মালায়শিয়া ইরানসহ পৃথিবীর অনেক দেশে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে সব মুসলিম শিক্ষার্থীর জন্য ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক চালু আছে। ইজরাইলের মত একটি দেশ ধর্মীয় শিক্ষাকে তাদের সিলেবাসে বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। বড় দুঃখের বিষয় বিদেশীর চাপে আমাদের দেশে তা করা হয়নি।

বিশ্ব মানবতার শান্তি প্রতিষ্ঠায় নৈতিক গুনাবলিসমৃদ্ধ জাতি গড়ে তোলার একমাত্র পথ হলো সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত পথে চলা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

''নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র জীবনাদর্শ''।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশে জেনারেল শিক্ষায় কুরআন হাদীস বাধ্যতামূলক অর্ন্তভূক্ত করা হোক। এবং বিবর্তনবাদের মত কূ-শিক্ষা সিলেবাস থেকে তুলে দেওয়া হোক।

অধ্যায় ১০:প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আবশ্যকতা

জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যে ক্রমবর্ধমার ও অগ্রসরমান পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে তাককালে দেখা যায় রিক্তহস্ত এক পৃথিবীকে এ রিক্ততা মানবতা-মনুষ্যতের, সততা- সহনুভূতির, কোমলতা আর উদারতার। আরো ভালো বলতে গেলে জ্যোতির্ময় এক আলোর। যে আলোয় একদিন আলোকিত হয়েছিল প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য। আজ সে আলোকেই স্তিমিত করার চেষ্টা পৃথিবীর তাবৎ শক্তিধারীর। একটি জাতির বিকাশ ও টিকে থাকা নির্ভর করে তাদের জ্ঞানগত উৎকর্ষতার উপরে। আর একটি সুন্দর ও সঠিক আর্দশ শিক্ষা ব্যবস্থাই তার মাধ্যম। শিক্ষা মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে। মূলত শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজ তার সমগ্র উন্নতি এবং প্রবৃদ্ধি সাধন করতে পারে। বলা হয় পৃথিবীতে যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। কোন জাতিই শিক্ষা ছাড়া তাদের ভাগ্যেন্নয়ন করতে পারে না।

প্রবাদে আছে : "তুমি যদি স্বল্পতম সময়ে ফল পেতে চাও তাহলে মৌসুমী ফসলের চাষ কর, তবে ফসল পাব একবার আর যদি ১০ বছর ধরে ফল লাভ করতে চাও তাহলে চাষ কর ফলদার বৃক্ষের। আর তুমি যদি শতাব্দীকাল ধরে ফল পেতে চাও, তাহলে মানুষ চাষ করা।"
আর উক্ত প্রবাদে বাক্যের আলোকে মানুষের চাষ মানে হল প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন। কারণ শিক্ষার হলো একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। যার উদ্দেশ্য এমন সব মানুষ তৈরি করা যারা আকিদা ধ্যান- ধারনা ও আদর্শের আলোকে একটি সক্রিয় সংস্কৃতি তৈরী করবে। আর সে সংস্কৃতির আলোকে একটি আদর্শ জাতি তৈরীতে সক্ষম হবে। জ্ঞানীরা যথার্থই বলেছেন, "যদি কোন জাতির ধ্বংস করতে চাও তাহলে সে জাতির গ্রন্থাগার গুলোকে ধ্বংস করো। ফলে সে জাতির শিক্ষা লাভ হতে বঞ্চিত হবে এবং মেরুদন্ডহীন মানুষের মত শিক্ষার অভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আর আল্লামা ইকবালের ভাষায়, "জ্ঞান বলতে আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিত্তিক জ্ঞানকে বুঝি। জ্ঞান প্রদান করে শক্তি আর এ শক্তি দ্বীনের অধিন হওয়া উচিত। কারণ তা যদি দ্বীনের অধিন না হয় তবে তা হবে নির্ভেজাল পৈশাতিক। এর বিপরীত হল্হৈ অর্থাৎ শিক্ষা

ব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ হলেই তার সুন্দর প্রয়াসী প্রভাব পড়তে বাধ্য গোটা জাতির মন-মানসিকতার আচার -আচরণের এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা : পৃথিবীর আকাশ থেকে ইসলাম নামক সৌভাগ্য সূর্য্য যখন অস্তমিত হলো তখন এমন একটি শাসকগোষ্ঠি বিজয়ী শক্তির আসনে অধিষ্ঠিত হলো দুনিয়ার জীবনই যাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ভোগ- বিলাসিতাই যাদের উন্নতির মূলকথা। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত বিজয়ী শক্তির আদর্শ, ভাব, ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্য পরাজিত শক্তির উপর যুগে যুগে দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতার পলাশী ট্রাজেডির মাধ্যমে মুসলিম শাসনের শোচনীয় পরাজয় হয়। ক্ষমতায় আসে ব্রিটিশরা। এর সাথেই সেদিন এ উপমহাদেশের সভ্যতা, ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার ভাগ্য নির্ধারন হয়ে যায়। উর্দু ও ফরাসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করা হয়। শিক্ষার বিষয় বস্তুকেও ইংরেজরা তাদের সভ্যতা ও আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করে নেয়।

এর প্রবর্তক লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালে এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ মালার ভূমিকায় বলেন, "আমরা অবশ্যই এমন একটি জাতি গঠন করব যারা রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু চিন্তা, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ"
এই মূলনীতির আলোকে রচিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল রাজ্য শাসন বিস্তার ও নিজেদের চিন্তা -চেতনার উপযোগী লোক তৈরী। ফলে আমাদের দেশ থেকেই তৈরি হচ্ছিল ব্রিটিশ শাসন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুগত মানুষ। সেদিন বাংলাদেশ ছিল উপমহাদেশের ক্ষুদ্র দেশ। অথচ আমরা সেই বিদেশী শক্তির দাসত্বের মন-মানসিকতার ও গোলামী চেতনা থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি আজও।

আমাদের দেশে মূলত দু'ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল এবং বর্তমানে আরো দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যথা :
(র) সাধারণ শিক্ষা।
(রর) মাদ্রাসা শিক্ষা।
(ররর) ইংলিশ মিডিয়াম।
(রা) কারিগরি শিক্ষা।

প্রচলিত শিক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি সমূহ : প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই শিক্ষিত হয়ে অনেক মেধাবীরা দেশ-বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে সত্য কিন্তু বেশ কিছু ত্রুটির কারণে জাতির সামগ্রিকভাবে শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ত্রুটি গুলোই আমাদের মেধাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ দিচ্ছে না। যার কারণে আমাদের শিক্ষা দীক্ষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার গতি এখনো খুবই ধীর। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক ত্রুটিগুলো পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা
- মেরুদন্ডহীন, অসৎ শিক্ষার ব্যবস্থা।
- নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা।
- প্রকৃত মেধার অবমূল্যায়ন।
- কোরআন-হাদিস বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা।
- প্রশ্ন ফাঁস ও অসদুপায় অবলম্বনে পূর্ণ স্বাধীনতা।
- মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বৈষম্য।
- নৈতিকতা বিধ্বংসী শিক্ষা ব্যবস্থা।
- পর্দাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা।
- জীবন-পদ্ধতি সম্পকে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা।
- নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে ব্যর্থতা।
- অপরাধনীতির লেজুর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা।
- ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা।
- ভর্তি বাণিজ্য।
- জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টিতে ব্যর্থতা।
- দুর্নীতির প্রসার।
- কর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

বর্তমানে প্রচলিত বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত আমাদেরকে নৈতিকতাহীন করে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকেই ধাবিত করছে।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল ও প্রভাব : মানুষের জ্ঞানগত পরিধি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার সমস্যা ততই জটিল হতে জটিলতার হয়ে যাচ্ছে। মানুষ বস্তুগত অগ্রগতি যত

বেশি লাভ করছে, নিজ নতুন, কামনা-বাসনা নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতা এবং নানারূপ নৈরাশ্য ও বঞ্চনার হাহাকার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অপ্রিয় হলেও বাস্তব যে বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সভ্য সমাজেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অপরাধের হার বেড়েই চলেছে। কেন না উন্নতির সোপান হিসেবে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্যবস্থা নেই।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল ও তার প্রভাব আলোচিত হলো :
মনুষ্যত্বের বিনাশ : প্রচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব সত্ত্বার চরম উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। এই কাজ করার ব্যপারে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আজ ব্যর্থ। অস্থিরতার এই ক্লান্তি লগ্নে যখন আমরা চারদিকে পৃষ্টি দেই, তখন দেখি যেন অন্ধকারের এক অর্থে সমুদ্র সর্বদিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে।

যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে : প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করার পরও অত্যন্ত সাধারণ অনেক বিষয়ে কোন রকম জ্ঞান অর্জন করা আমাদের হয় না। সর্ব পর্যায়ে মুখস্ত বিদ্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু টেকনিক্যাল ও লজিক্যাল বিদ্যা গুরুত্ব পাচ্ছে না কারণ পাঠ্য সুচীকে এমন ভাবে গঠন করা হয়েছে গৎবাঁধা মুখস্ত না করলে কোন ভাবেই ভাল ফলাফল করা সম্ভব না।

আবার গত কয়েক বছর ধরে পাবলিক পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি এক প্রকার open secret-এ রূপ নিয়েছে। বিষয়টিও ভয়াবহ এক সংস্কৃতি যুক্ত হয়েছে। পরীক্ষার সময় টার্গেট নির্ধারণ করে দেয়া হয়, যাতে কেউ পরীক্ষায় ফেল না করে। আর সমাপনী পরীক্ষায় নাকি এমনও নির্দেশ দেওয়া থাকে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারুক বা না পারুক বা সেভাবেই হোক লিখিয়ে শতভাগ পাস নিশ্চিত করতে হবে। এমন অবস্থা সে পরীক্ষার খাতায় পাস মার্ক না ওঠলে সেখানে খাতা মূল্যায়ন কারীরাই লিখে পাস মার্ক দিতে হবে। এবিষয়টি P.S.C,J.S.C, S.S.C ও H.S.C পরীক্ষায় পাসের হার বাড়িয়ে দিলেও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার মান বেড়েছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

কেননা, সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর থেকে জানা যায় "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অংশ গ্রহণকারী GPA-5 প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৮০% ছাত্র-ছাত্রীই ন্যূনতম পাস মার্ক পায়নি এ চিত্র কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রেই নয় মেডিক্যাল, বুয়েট থেকে শুরু করে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই অতিরঞ্জিত গ্রেড নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ পাওয়া দূরে থাকুক পাস পর্যন্ত করতে পারে না তখন তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়। শুধু শিক্ষার হার বাড়লেও কমছে শিক্ষার মান।

মূল্যবোধের অবক্ষয় : প্রচলিত শিক্ষার অর্জন করে এমন আয় কেউ মূল্যবোধ অর্জন করতে পারছে না যদিও শিক্ষায় মূল উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। পৃথিবীর অগ্রযাত্রার সাথে সাথে মানুষের প্রতি মানুষের মূল্যবোধ কমে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের মায়া মমতা, মহব্বত ইত্যাদি। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ক্রমশই বাড়ছে সমাজ মূল্যবোধ অবক্ষয়।

নৈতিকতার অধঃপতন : বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার বদলে অনৈতিক শিক্ষা দেয়া, ইতিহাসকে বার বার বদলে দেয়া, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করার মাধ্যমে এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভুল পথেই বেশি নেয়া হচ্ছে যার ভয়াবহ চিত্র আজ সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুধু নৈতিক অধঃপতন-ই নয় শিক্ষার মানও কমে যাচ্ছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ফলে আকাশ সংস্কৃতিতে ছেঁয়ে গেছে গোটা বিশ্ব প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে না পারায় মানুষ তাদের নিজস্ব আচার আচরণ রীতি-নীতি ভুলে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করছে।সুশিক্ষার অভাবে মানুষ শিক্ষা অর্জন করে কিছু শিখতে পারছে না। যা দেখছে সেটাই গ্রহণ করছে। ভাল মন্দের পার্থক্য তাদের বিচার-বিবেচনার বাইরে।

প্রকৃত মেধার অবমূল্যায়ন : প্রকৃত শিক্ষা অর্জন না করায়, অর্থাৎ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে পাস করা হচ্ছে। যেমন নকল করে, পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন ফাঁস, রাজনৈতিক ক্ষমতা, শিক্ষকদের দুর্বলতা, প্রশাসনিক দুর্নীতির ইত্যাদির কারণে আজ প্রকৃত মেধাবী

মুখ বাছাই করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে এবং আসলে প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন করা হচ্ছে না যার ফলে দেশ ও জাতির উন্নতির পথে চরম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ইসলামী জ্ঞানের ক্রমশ হ্রাস : বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি-নৈতিকতা ঈমান আকীদা আমল ইত্যাদি বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা। যদিও ধর্ম শিক্ষা নামে মাত্র দেয়া হয় তাও সঠিক নয় ভ্রান্ত দিনে দিনে ইসলামী শিক্ষার ক্রমশ হ্রাসই হচ্ছে। যার ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি হচ্ছে। মনুষ্যত্ববোধ কমে যাচ্ছে। নীতি নৈতিকতা বলতে সমাজে কিছু থাকছে না।
এছাড়াও প্রচলিত শিক্ষার ফলে প্রযুক্তি অপব্যবহার বাড়ছে, প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় হচ্ছে, সামাজিক অসচেতনতা, অনৈতিক ভাবে ধনবান, যুব সমাজের অবক্ষয় ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার লাভ করছে।

মনুষত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষ নামের প্রকৃত স্বার্থকতা আয় মনুষত্বের বিকল্প সাধনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে শিক্ষা। তাই একটি জাতির উথান-পতনের অনেকটাই নির্ভর করে সেই জাতির শিক্ষাব্যবস্থার উপর। শিক্ষা ব্যবস্থা যদি পূর্ণভাবে জাতির মধ্যে মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে তাবেই সম্ভব একটি আদর্শ জাতি তথা আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা কিন্তু আজ অন্যায় অনাচার, অনৈতিকতার সয়লাবে ভেসে যাওয়া এই সমাজের চিত্র এ কথা আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রচালিত বস্তুগত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব সত্ত্বার দুটি দিকের একটি অর্থাৎ জৈবিক সত্ত্বাকে উন্নত করতে পারলেও মানব সত্ত্বার মূল যে নৈতিক সত্ত্বার চরম উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের উন্নয়ন, এই কাজটি করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।"

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্যতা : "Islam is complete code of life" অর্থাৎ ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয়, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা আলোকে চিনতে সাহায্য করে। সঠিক ও সাফল্যের পথে চলতে সহায়তা করে।
আল্লাহর প্রিয় বান্দা, সমাজের বাঞ্ছিত ও দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য যা যা দরকার তার সব কিছুর ব্যবস্থাই ইসলামে বিদ্যমান। মোট কথ মানব

জীবনের ও মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন সুবিধার ও ন্যায় নীতি ভিত্তিক শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রগতিশীল সমাজ গঠিন ও সংরক্ষণে ইসলামের বিকল্প নেই।
মহান আল্লাহর ঘোষণা "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর এবং পুরোপুরি মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না। (আল- ইমরান : ১০২)

একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে,ইসলামের শিক্ষা অনুসরন করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সাম্য, উদার মানবতাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে চলতে হয়। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী চলতে হলে ইসলাম বিষয়ক জ্ঞানার্জন এবং ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত আবশ্যক। সর্বপ্রথম নবী হয়রত আদম (আsmile থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সsmile পর্যন্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য যত নবী রাসুল এসেছেন, তারা সবাই ইসলামের সুন্দর ও শাশ্বত শিক্ষা প্রচার করেছেন। ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়গুলি জানা এবং সে অনুযায়ী চলা ফেরা আইন।বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা ফরযে কিফায়া।

ইসলাম শিক্ষার গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :
ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা ফরযে আইন : ইসলামের আকিদা বিশ্বাস এবং ইবাদত করতে ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন
ততটুকু ইসলাম শিক্ষা অর্জন করা ফরযে আইন।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমাদের সমাজ থেকে এক একটি দল কেন বেরিয়ে আসেনা, এ উদ্দেশ্যে যে, তারা দীন
সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের লোকদের সেই জ্ঞান সতর্ক দ্বারা করে তুলবে।" (তোওবা : ১২২)
রাসুল (সাsmile বলেন, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয" - (ইবনে মাজা)

আল্লাহু পরিচিতি ও আল্লাহু ভীতির জন্য অপরিহার্য : ইসলাম শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বা আল্লাহ তা'আলাকে চেনা। আল্লাহকে চিনতে হলে

এবং সঠিকভাবে তার প্রতি বিশ্বাস করতে আল্লাহ পাক ও সিফাত, অর্থাৎ আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। আত্মপরিচয় এবং সৃষ্টি জগতকে পর্যালোচনার মাধ্যমে আল্লাহকে জানা যায়, আর এ জানার মাধ্যমেই প্রত্যয় জন্মে।

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে" (ফাতির-২৮)

আল্লাহ পাকের প্রথম বাণীতে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ : আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সাsmile এর প্রতি প্রথম ওহিতেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে আমরা জ্ঞান অর্জন তথা ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

দ্বীন ইসলামকে সমুন্নত রাখা : দ্বীনের প্রচার, প্রতিষ্ঠা সমুন্নত ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য ইসলাম শিক্ষা অপরিহার্য। ইসলাম শিক্ষা ছাড়া দ্বীনের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবন সম্ভব নয়। পূর্বে নবীর পরে অন্য নবী আসতেন।

সুতরাং দ্বীন প্রচারে উম্মতের তেমন দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাsmile সর্বশেষ নবী। তার পরে কোন নবী আসবেন না। সুতরাং দ্বীন প্রচার প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবনের দায়িত্ব তার উম্মতের। আর এ দায়িত্ব পালন করার জন্য ইসলাম শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। "জ্ঞানীরাই হচ্ছেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। তবে নবীগণ তো ধন-দৌলতের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাননি বরং উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন ইলম বা ইসলাম শিক্ষা, যে ব্যক্তিই তা গ্রহণ করল, সেই একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পদ প্রাপ্ত হলো। - (তিরমিযী)

ভালো মন্দের পার্থক্য : সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ইসলামি জ্ঞানের একান্ত আবশ্যক।জ্ঞান ছাড়া এ পার্থক্য করা অসম্ভব।

সারারাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম : ইসলামে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব এত বেশি যে, রাসুল (সাsmile বলেছেন, "রাতে এক ঘন্টা জ্ঞানচর্চা করা সারারাতের ইবাদতের চেয়েও উত্তম"- (মিশকাত শরীফ)

চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন ও মানবতার বিকাশ : মানুষের মেধা, মননশীলতা শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত হয়। এর মাধমে আত্মার উন্নতি হয়। মানুষের মধ্যে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি মানবীয় গুনাবলি উৎকর্ষিত ও বিকশিত হয়। আচার-আচরণ পরিশীলিত

ও পরিমার্জিত হয়। এতে চারিত্রিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, মানবিক গুনাবলির বিকাশ ঘটে। মানবতা সমুন্নত হয়।

মর্যাদার মাপকাঠি- শিক্ষাই সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি, আল্লাহ তা'আলা আদম (আsmile কে ফেরেস্তাদের ওপরেও মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তার মানদ›ড ছিলো শিক্ষা। ফেরেস্তারা আদম(আsmile এর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে, ত্র প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "জ্ঞানীরা আর মুর্খরা কি সমান হতে পারে।"

মহানবী ﷺএর নির্দেশ : রাসুল ﷺ বলেছেন "ফরয কর্তব্যগুলো পালন কর এবং কুরআন শিক্ষা কর এবং লোকদেরও শিক্ষা দাও, কেননা আমি মৃত্যুর অধীন।" - (তিরমিযী)

রাসুল (সাsmile বলেছেন, "প্রয়োজন হলে চীন দেশে গিয়েও বিদ্যা শিক্ষা কর, বিদ্যা অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে ফরজ"। - (ইবনে মাজাহ)

হালাল উপার্জন : হালাল উপার্জনে সহায়তা এবং আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলাম শিক্ষা প্রয়োজন।

জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা : মহানবী (সাsmile বরেছেন,"যে ব্যক্তি ইসলামকে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, নবীগণ ও তার মধ্যে মাত্র একটি স্তরের ব্যবধান থাকবে।"- (দারেমী)

পাপ মোচন : জ্ঞানান্বেষণকারীর প্রতি খুশি হয়ে আল্লাহ তা'আলা তার পুর্বের পাপ মোচন করে দেন।

রাসুল (সাsmile বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করে তার অতিতের পাপ মোচন হয়ে যায়" - (তিরমিযী)

রাসুল (সাsmile বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে বের হয় সে না ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর পথে থাকো"- (তিরমিযী)

দুআ লাভ : মানুষ যে উত্তম শেখায় তার জন্যে আল্লাহ তা'আলা, তার ফেরেস্তারা , আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসিরা এমনকি গর্তের পিঁপড়া আর সাগরের মাছও দুআ করে" -(সুনালে তিরমিযী)

আমরা জ্ঞানান্বেষণে ব্রতী হব এবং জ্ঞান চর্চায় সাধ্যমত অবদান রাখব। আমরা স্বপ্ন দেখি, আমাদের এই দেশ হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি, সমৃদ্ধ, মানব সম্পদে পরিপূর্ণ এক দেশ। যে দেশ থেকে এমন মানুষ বেরিয়ে আসবে, যারা শুধু জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠ হবে না বরং উন্নত চরিত্রের, সর্বোত্তম নৈতিকতার প্রকাশ থাকবে তাদের মাঝে। কিন্তু এই স্বপ্ন পূরণের জন্য, সেই কাঙ্খিত মানের মানুষ গড়তে একটি যথার্থ, আদর্শ মানের শিক্ষাব্যবস্থা প্রনয়ণ প্রথম ও প্রধান শর্ত। ইতিহাসের দৃষ্টান্তগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয়, ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশের সেই দাবি সর্বোত্তমভাবে পূরণ হওয়া সম্ভব।

অধ্যায় ১১: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ।

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য এখন অনেকাংশে কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক সফলতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের দিকে কেন্দ্রীভূত। এর ফলে নৈতিকতা, মানবিকতা, ধর্মীয় চেতনা ও আত্মিক উন্নয়নের বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হচ্ছে।

ইসলাম শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখে না; বরং মানুষকে নৈতিক, আদর্শবান, দায়িত্বশীল ও আল্লাহভীরু হিসেবে গড়ে তোলাকেই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে মনে করে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধের চর্চা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভোগবাদ, অসততা, আত্মকেন্দ্রিকতা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, ধর্মীয় উদাসীনতা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় চ্যালেঞ্জ।

ইসলামি মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ক) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার আধিপত্য

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার চেয়ে পেশাভিত্তিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের ভালো চাকরি ও উচ্চ বেতনের জন্য প্রস্তুত করা হলেও তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতি তুলনামূলক কম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইসলামি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং মানবকল্যাণে কাজ করা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় অনেক সময় ধর্মীয় অনুশাসনকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করলেও নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।

প্রভাব:

* আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার অভাব সৃষ্টি হয়
* অসততা, দুর্নীতি ও প্রতারণার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়
* মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ কমে যায়
* শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়
* আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী মানসিকতা বৃদ্ধি পায়

খ) পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব

গ্লোবালাইজেশন, স্যাটেলাইট মিডিয়া, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতি তরুণ সমাজের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে। পশ্চিমা সংস্কৃতির কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও অন্ধ অনুকরণের ফলে অনেক নেতিবাচক দিক সমাজে প্রবেশ করছে। যেমন—অশ্লীলতা, অবাধ মেলামেশা, মাদকাসক্তি, উগ্র ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং অতিরিক্ত ভোগবাদ।

অনেক তরুণ ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে পুরোনো বা অনাকর্ষণীয় মনে করে পশ্চিমা জীবনধারাকে আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করছে। ফলে ইসলামি পোশাক, শালীনতা, পারিবারিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুশীলনের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রভাব:

* ইসলামি পোশাক ও শালীন আচরণের প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হয়
* পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা দুর্বল হয়ে পড়ে

* ধর্মীয় পরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ হ্রাস পায়
* অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার বিস্তার ঘটে
* তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তি ও অপরাধপ্রবণতা বাড়ে।

গ) প্রযুক্তির অপব্যবহার

প্রযুক্তি আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এর অপব্যবহার শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানসিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক শিক্ষার্থী অতিরিক্ত সময় ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব বা অনলাইন গেমে ব্যয় করে। অনেকে অনৈতিক ও অশ্লীল কনটেন্টে আসক্ত হয়ে পড়ে। এতে তাদের সময় নষ্ট হয় এবং মানসিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার ধর্মীয় চর্চা ও পারিবারিক যোগাযোগ থেকেও দূরে সরিয়ে দেয়।

প্রভাব:

* পড়াশোনায় অমনোযোগ ও ফলাফল খারাপ হওয়া
* সময়ের অপচয় ও অলসতা বৃদ্ধি
* মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা সৃষ্টি
* অনৈতিক কনটেন্টে আসক্তি বৃদ্ধি
* ধর্মীয় অনুশীলন ও ইবাদতে অনীহা সৃষ্টি

ঘ) পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

পরিবার হলো শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষালয়। শিশুর নৈতিকতা, ধর্মীয় চেতনা ও চরিত্র গঠনে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে অনেক পরিবারে

ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিক অনুশীলনের পরিবেশ কমে যাচ্ছে। বাবা-মা সন্তানের জাগতিক সফলতা, ভালো ফলাফল ও ক্যারিয়ার গঠনের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন; কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

অনেক পরিবারে নিয়মিত নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামি আলোচনা বা নৈতিক শিক্ষার চর্চা কমে গেছে। ফলে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

প্রভাব:

* ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় অনুশীলনের অভাব তৈরি হয়
* বাবা-মা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়
* আত্মকেন্দ্রিক ও দায়িত্বহীন মানসিকতা তৈরি হয়
* পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে
* নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

ঙ) আদর্শ শিক্ষকের সংকট

একজন শিক্ষক শুধু জ্ঞানদানকারী নন; তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক পথপ্রদর্শক ও আদর্শও। ইসলামি দৃষ্টিতে শিক্ষকতার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। কিন্তু বর্তমানে অনেক শিক্ষক কেবল পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন, শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন না।

যখন শিক্ষক নিজেই আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হন না, তখন শিক্ষার্থীরাও অনুপ্রেরণা হারায়। ফলে শিক্ষা কেবল পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়; চরিত্র গঠনের মাধ্যম হিসেবে তার গুরুত্ব কমে যায়।

প্রভাব:

* শিক্ষার্থীদের নৈতিক দিকনির্দেশনার অভাব দেখা দেয়
* শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে
* শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়
* অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অভাবে তরুণরা বিভ্রান্ত হয়
* শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ কমে যা।

অধ্যায় ১২. ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষায় করণীয় ও সমাধান

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, ন্যায়, সততা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। বর্তমান যুগে প্রযুক্তির অপব্যবহার, নৈতিক অবক্ষয়, অসততা, মাদকাসক্তি, অশ্লীল সংস্কৃতির বিস্তার এবং পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতার কারণে ইসলামি মূল্যবোধ নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তাই ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। নিচে ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় ও সমাধান বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ক) শিক্ষাক্রমে ইসলামি নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা-

শিক্ষা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, আর নৈতিক শিক্ষা মানুষকে আদর্শবান করে তোলে। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামি নৈতিকতা, সততা, মানবতা, শৃঙ্খলা ও চরিত্র গঠনের বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কেবল পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; বরং একজন সৎ, দায়িত্বশীল ও নৈতিক মানুষ তৈরি করাই প্রকৃত শিক্ষা।

করণীয়:

১. কুরআন ও হাদিসভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা চালু করা

শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই কুরআন ও হাদিসের আলোকে সত্যবাদিতা, ধৈর্য, সহানুভূতি, দয়া ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দিতে হবে। মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরলে তারা উত্তম চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।

২. বাস্তব জীবনের নৈতিক শিক্ষা প্রদান

শুধু বইভিত্তিক শিক্ষা নয়, বাস্তব জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। যেমন—বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, অসহায়দের সাহায্য করা, মিথ্যা না বলা, প্রতারণা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

৩. পরীক্ষাভিত্তিক নয়, আচরণভিত্তিক মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর শুধু লিখিত পরীক্ষার ফল নয়, তার আচরণ, শৃঙ্খলা, সততা ও সামাজিক দায়িত্ববোধকেও মূল্যায়ন করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা নৈতিক আচরণে উৎসাহিত হবে।

খ) পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি

পরিবার শিশুর প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সন্তান পরিবার থেকেই নৈতিকতা, আদর্শ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ শিখে থাকে। তাই পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

করণীয়:

১. নিয়মিত নামাজ ও কুরআন শিক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলা

অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামি আদব-কায়দা শেখানো। এতে তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি ও নৈতিকতা তৈরি হবে।

২. সন্তানদের সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনা করা

বাবা-মা সন্তানদের সঙ্গে ইসলামি ইতিহাস, নবী-রাসূলদের জীবনী ও নৈতিক শিক্ষামূলক গল্প আলোচনা করতে পারেন। এতে সন্তানদের ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।

৩. নৈতিক আচরণের বাস্তব উদাহরণ সৃষ্টি করা

শুধু উপদেশ দিলেই হবে না, বাবা-মাকে নিজেদের আচরণের মাধ্যমেও সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে। কারণ শিশুরা বড়দের অনুসরণ করে শেখে।

গ) প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা

বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তি মানুষের জ্ঞান ও উন্নয়নের মাধ্যম হলেও এর অপব্যবহার নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে। তাই প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জরুরি।

করণীয়:

১. শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া

ইন্টারনেট ব্যবহারের শিষ্টাচার, অনলাইনে ভদ্র আচরণ, গোপনীয়তা রক্ষা এবং ক্ষতিকর কনটেন্ট থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিতে হবে।

২. অনলাইন কনটেন্ট ব্যবহারে অভিভাবকীয় তদারকি

অভিভাবকদের উচিত সন্তানরা কী ধরনের ওয়েবসাইট, ভিডিও বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করছে তা পর্যবেক্ষণ করা।

৩. ইসলামি শিক্ষামূলক অ্যাপ ও কনটেন্ট ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া

শিক্ষার্থীদের ইসলামি বই, লেকচার, কুরআন শিক্ষা অ্যাপ এবং শিক্ষামূলক ভিডিও ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।

ঘ) আদর্শ শিক্ষক তৈরি করা

শিক্ষক জাতির নির্মাতা। একজন আদর্শ শিক্ষক শুধু পাঠদান করেন না; তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

করণীয়:

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণে নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সময় নৈতিকতা, মানবিকতা ও ইসলামি মূল্যবোধ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২. শিক্ষকদের চরিত্র ও আচরণের মূল্যায়ন
শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচরণ মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তুললে তারা শিক্ষকদের অনুসরণ করতে আগ্রহী হবে।

ঙ) সহশিক্ষা কার্যক্রমে ইসলামি সংস্কৃতি চর্চা

সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামি সংস্কৃতি ও নৈতিকতাভিত্তিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

করণীয়:
১. ইসলামি বিতর্ক, কিরাত ও হামদ-নাত প্রতিযোগিতা আয়োজন
এসব প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় জ্ঞান ও ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।

২. নৈতিকতা বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা
সততা, মানবতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও ইসলামি আদর্শ নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজন করা যেতে পারে।

৩. সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ
গরিব-অসহায়দের সাহায্য, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও মানবসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়।

ইসলামি মূল্যবোধ একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। বর্তমান যুগের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় পরিবেশ, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার,

আদর্শ শিক্ষক এবং ইসলামি সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। ইসলামি মূল্যবোধ অনুসরণ করলে ব্যক্তি জীবনে শান্তি, সমাজে শৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

অধ্যায় ১৩. ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

ইসলামি মূল্যবোধ মানবজীবনে শান্তি, ন্যায়, শৃঙ্খলা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করে। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত যথেষ্ট নয়; বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত উদ্যোগও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে নৈতিক অবক্ষয়, অসততা, সহিংসতা ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় নীতি, সামাজিক সচেতনতা এবং নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব।

রাষ্ট্রের ভূমিকা:

রাষ্ট্র একটি দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। নাগরিকদের নৈতিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১. শিক্ষানীতিতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি

শিক্ষা মানুষের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র গঠনের প্রধান মাধ্যম। তাই রাষ্ট্রকে এমন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে যেখানে আধুনিক জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

করণীয়:

* প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ইসলামি নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা
* কুরআন ও হাদিসভিত্তিক মানবিক শিক্ষা চালু করা
* শিক্ষার্থীদের সততা, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা
* শুধু পরীক্ষাভিত্তিক নয়, আচরণভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করা

গুরুত্ব:

এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞান অর্জন করবে না, বরং নৈতিক ও আদর্শ মানুষ হিসেবেও গড়ে উঠবে।

২. মিডিয়ায় অশ্লীল ও অনৈতিক কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ

বর্তমান যুগে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের চিন্তাভাবনা ও আচরণে গভীর প্রভাব ফেলে। অশ্লীলতা, সহিংসতা ও অনৈতিক কনটেন্ট তরুণ সমাজকে বিপথগামী করতে পারে।

করণীয়:

* টেলিভিশন, সিনেমা ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনৈতিক কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা
* শিক্ষামূলক ও নৈতিক অনুষ্ঠান প্রচার বৃদ্ধি করা
* শিশু ও কিশোরদের জন্য নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ নিশ্চিত করা
* সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো

গুরুত্ব:

এর ফলে সমাজে নৈতিকতা ও শালীনতা বজায় থাকবে এবং তরুণ প্রজন্ম ইতিবাচক সংস্কৃতির দিকে আগ্রহী হবে।

৩. ইসলামি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ

ইসলামি সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা ও মানবিকতায় সমৃদ্ধ করে। তাই রাষ্ট্রকে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করতে হবে।

করণীয়:

* ইসলামি সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো
* জাতীয় পর্যায়ে ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
* মসজিদ, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন
* ইসলামি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

গুরুত্ব:
এতে নতুন প্রজন্ম নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হবে

সমাজের ভূমিকা

সমাজ মানুষের আচরণ ও চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি নৈতিক সমাজ গঠনের জন্য সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

১. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

সমাজে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি।

করণীয়:
* মাদক, দুর্নীতি ও অপরাধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি
* নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা সভা ও সেমিনার আয়োজন
* পরিবার ও সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা
* সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি

গুরুত্ব:

সচেতন সমাজ অন্যায় ও অনৈতিক কাজ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

২. মসজিদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রচার

মসজিদ শুধু ইবাদতের স্থান নয়; এটি নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার কেন্দ্রও বটে।

করণীয়:
* মসজিদে নিয়মিত ইসলামি আলোচনা ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান
* সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা

* তরুণদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা
* সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে মানবসেবামূলক কাজ পরিচালনা

গুরুত্ব:
এর মাধ্যমে সমাজে ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পাবে।

৩. তরুণদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা

তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে সমাজ উন্নত হবে।

করণীয়:
* খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি
* ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন
* প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার শেখানো
* মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে রাখতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা

গুরুত্ব:
ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলে তরুণরা নৈতিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামি মূল্যবোধের সমন্বয়

আধুনিক শিক্ষা মানুষকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের উন্নয়নে সহায়তা করে। তবে শুধু জাগতিক শিক্ষা মানুষের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে না। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবে সমাজে অসততা, দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়।

তাই আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ইসলামি মূল্যবোধের সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা আধুনিক জ্ঞানে দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতেও সমৃদ্ধ হয়।

সমন্বয়ের উপায়:

* বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা প্রদান
* শিক্ষার্থীদের মানবসেবা ও সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করা
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি
* প্রযুক্তির সঠিক ও কল্যাণমূলক ব্যবহার নিশ্চিত করা

ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ছাড়া একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব নয়। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রকে একযোগে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রকে নৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে এবং সমাজকে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ইসলামি মূল্যবোধের সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তবেই একটি নৈতিক, মানবিক ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

উপসংহার

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু একই সঙ্গে নৈতিকতা, ধর্মীয় চেতনা ও ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজে উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তুবাদী সফলতা ও পেশাগত অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও চরিত্র গঠন, নৈতিক শিক্ষা এবং আত্মিক উন্নয়নের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসততা, দায়িত্বহীনতা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক অবক্ষয় এবং ধর্মীয় অনাগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা শিক্ষা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়। তাই আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ইসলামি আদর্শ ও নৈতিকতার সমন্বয় সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ এবং রাষ্ট্র—সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, দায়িত্ববোধ, মানবতা, আল্লাহভীতি ও নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার, আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা, পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি এবং ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি বলা যায়, ইসলামি মূল্যবোধবিহীন শিক্ষা কখনো একটি আদর্শ সমাজ গঠন করতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা, যা মানুষকে জ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি নৈতিক, মানবিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। তাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

তথ্যসূত্র:

আল- কুরআন
সহীহ বুখারি
আত তিরমিজি ও অন্যান্য।
https://dailyinqilab.com/religion-philosophy/article

/759867https://alaponblog.com/post/1516/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE

https://www.anjumantrust.org/2023/12/10/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%B8/

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=721721224634696&id=100044239518903

https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10606

https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10608

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87_%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE

https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/03/10/1012441

https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/03/10/1012441

https://www.icsbook.info/read-book/264?fbclid=IwY2xjawRuDl1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA80MDk5NjI2MjMwODU2MDkAAR5J59NDAGiJR_5MDm7OtSAzGG6i1kicJW3gPRlkaAbbCNkBvQDZ_5tkzZUmsA_aem_dQ4unZB8FKJVJw1TF67Yuw

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fzsijyage4

https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Abrar_Fahad

https://www.kalerkantho.com/print-edition/priyo-desh/2026/04/26/1676551